ঝড় ও ঝরাপাতা

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু

কায়স্থের ছেলে। পূর্বপুরুষের ইতিকথার মধ্যে কোন রাজারাজড়ার কাহিনী প্রচলিত নেই, উপাধিতে রায়চৌধুরী কিম্বা শুধু রায়, কি শুধু চৌধুরীত্বের অলংকার নেই; শুধু মিত্র: আছে শুধু প্রবাদ অনুযায়ী 'ঘোষ-বোস—মিত্র কুলের অধিকারী' কুলগৌরব। সুতরাং এককালে নিঃসংশয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত ছিল—বর্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পড়বে সে কথা বিবেচনাসাপেক্ষ। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছিল—বর্তমানে বিত্ত-নিঃশেষিত। জীবিকায় 'দিন আনে দিন খায়' নয়, বাঁধা মাইনের বাবু পদবীর চাকুরে—কিন্তু দিন আনার ব্যবস্থা না করলে দিন যায় না। আপিসের দারোয়ানদের কাছে ধার করে মাসের মাইনে থেকে সুদ সমেত টাকা শোধ করে। কাবুলীর কাছেও ধার করে মধ্যে মধ্যে, তারা দু'-তিনজন মিলে পাড়ার গলির মুখে বসে থাকে; দারোয়ানের দেনা শোধের পর উদ্বৃত্ত থেকে তাদের টাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে নিঃশেষিতবিত্ত হয়ে। তবু চালে চলনে প্রাণপণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতান্ত সীমার শেষ খুঁটিটি কোন রকমে আঁকড়ে ধরে আছে। সংসারের সংস্থানে বিত্ত নিঃশেষিত অন্তরের মধ্যে চিত্তও অসার। ছেলেগুলো যে ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হয়ে দুঃখ ঘুচাবে, এ কল্পনাটুকু করবারও শক্তি অথবা প্রবৃত্তি নেই। নিজে পড়েছিল ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ক্লাস পর্যন্ত—সে অনেক দিনের কথা—তখনও ক্লাস গণনা—নীচে থেকে গুনে থার্ড ক্লাসকে 'ক্লাস এইট' বলত না। বর্তমানে সেকালের পড়া খান-কয়েক বইয়ের নাম মাত্র মনে আছে,—তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ব্যাকরণ-কৌমুদী—মলাটে তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি ছাপা ছিল—ইংরাজী ব্ল্যাকী এ্যান্ড স্মিথ্স্ রীডার; ভিতরের বস্তু মনে থাকবার মধ্যে আছে—নরঃ নরৌ নরাঃ—আর 'টেল মি নট্ ইন্ মোর্ণফুল নাম্বার/লাইফ ইজ বাট এ্যান এম্প্টি ড্রীম'-এর একটা প্যারাগ্রাফ মাত্র। বাংলা বইগুলোর নাম মনে নেই, তবে গল্প-টল্প—জীবনীকথা দু'-চারটে মনে আছে।

ছেলেগুলো পথে মারামারি করে, গুলি খেলে, স্কিপিং করে, অনবরত নাচে, ধুলো মাখে, অশ্লীল গাল দেয় পরস্পরকে—তাও মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় না। চেয়ার-টেবিলে বসে চাকরি নয়; খিদিরপুর থেকে হাওড়ার পোল পর্যন্ত শেডে-ইয়ার্ডে-জেটীতে ঘুরতে হয়: একস্পোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানীর সরকার বাবু—মালখালাস মাল-বোঝাইয়ের তদারক এবং হিসেব রাখা কাজ; দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ দেখে মধ্যে মধ্যে আপিসে এসে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকাণ্ড বড় টেবিলের সামনে একখানা হাতলভাঙা চেয়ার টেনে বসে রিপোর্ট লিখে দাখিল করে। বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ দেয়—বড়বাবু তিরস্কার করেন, ইংরেজ বড় সাহেব তিরস্কারের ধার ধারেন না—সোজা বলেন—ইডিয়ট, ননসেন্স, রাস্কেল; গোপেন মাথা নীচু করে—লজ্জায় বা দুঃখে কিম্বা ভয়েও নয়, মাথা উঁচু করে শুনলে বড়বাবু বা বড় সাহেব বেশী চটে যাবে বলে মাথা নীচু করে সে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত রুমালে কপাল এবং মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বলে শালাঃ! কাকে বলে সে, অর্থাৎ গালাগালিটা বড়বাবুকে বা বড় সাহেবকে অথবা যে দুঃসময়টা গেল তাকে কিম্বা নিজের ভাগ্যকে, কি সবগুলোকে জড়িয়ে সকলকে দেয় কিম্বা কাউকেই না দিয়ে শুধু অভ্যাস বশতই বলে, সে-কথা সে নিজেও জানে না! এর পরই সে বিড়ির তৃষ্ণা অনুভব করে, জল খেয়ে, টাইপরাইটারের রিবনের কৌটা—যেটাকে সে বিড়ি-কেস হিসেবে ব্যবহার করে সেইটে বের করে প্রথমে ঢাকনার উপর একটা আঙুলের টোকা দেয়—তারপর সেটাকে খুলে টিপে-টিপে দেখে একটি নিটোল বিড়ি বেছে নিয়ে, দুমুখে ফুঁ দিয়ে মুখে পুরে ধরিয়ে, উঁচু দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বাড়িতে ফিরে কোন দিন ছেলেগুলোকে প্রহার করে—কোন দিন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে, মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর কান্নাও শোনা যায়। সম্ভবত প্রহারও করে। কোন দিন সকালে গিয়ে ফেরে তিনটে চারটেয়, কোন দিন বেলা এগারটায় বেরিয়ে রাত্রি ন'টায়। চাকরির সর্বাপেক্ষা মনোহারী অংশটুকু হল ট্রামে যাওয়া-আসা।

কোম্পানী ওকে একখানা শ্যামবাজার সেক্‌সনের মান্থলী টিকিট দিয়েছে, কোম্পানীর কাছে মাইনের কৃতজ্ঞতার চেয়েও এই কৃতজ্ঞতাটাই অনেক বেশী। বিশেষ করে রাত্রে ফেরবার সময় ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে বসে দু'ধারে আলোকোজ্জ্বল দোকানসারির দিকে অলস দৃষ্টিতে চেয়ে ফেরাটা একটা বিলাস। ন'টার পর ট্রামের ভিড়ও কম হয়ে আসে। দু'-একদিন ভিড় হয় কিন্তু গোপেনের সব চেয়ে বড় সুবিধে সে ওঠে ডালহৌসি অথবা এসপ্লানেডে—একেবারে ছাড়ার জায়গা হতে। স্ট্রান্ড রোড হেঁটে এইটুকু এসে সে খালি গাড়ির সিটে জানলার ধার ঘেঁষে বসে। সিটের মধ্যে তার আবার বাছাই করা সিট আছে। নতুন ট্রামে সে বসতে চেষ্টা করে—দরজার পাশেই লেডিজ সিটের পিছনের সিংগল্‌ সিটটিতে। যে ট্রামে একেবারে সামনে গাড়ির পিছনের দিকে মুখ করে বসবার আসন আছে, সে ট্রামে গোপেন সেই সিটে বসে। অন্য সিটের লোক যখন ঘাড় বেঁকিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেডিজ সিটের দিকে তাকায়, তখন ঐ সিটে বসে সে মুচকে হাসে।

* * * *

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আজ আসছিল সে খিদিরপুর থেকে। কোম্পানীর লরীতে গঙ্গার ধার দিয়ে এসে সে মোড়ে নামল। মোটরের ইঞ্জিনের গরম এবং পেট্রোলের গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে আরাম বোধ করলে। অভ্যাস মত একবার বললে—শালাঃ। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে। শরীর তার সবল—এবং এই কাজের অভ্যাস তার পঁচিশ বছরের, ক্লান্তি সে বড় বোধ করে না। ডালহৌসির কোণে সে এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! ট্রাম যে সারি সারি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক—ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাযাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পুলিশ দু'বার লাঠিচার্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ, রঙ দেখে আর চেনা যায় না। আলো-বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌলুস কালচে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক-আধটা জায়গায় জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতরটা এখনও কাঁচা আছে। হাফসোল মারা সত্ত্বেও গোড়ালী-ক্ষয়ে-আসা স্যাণ্ডেলের তলাটা— দুপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চট-চট করে উঠল।

ফেয়ারলি প্লেসের সামনে; উত্তর-মুখে চলে গিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীট।

কি লাগল পায়ে? কে জানে কি? হন্‌ হন্‌ করে চলেছে গোপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে?

জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ার। খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাক্টার ড্রাইভারেরা উদাসীনের মত দাঁড়িয়ে অথবা বসে রয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না।

গোপেন চলেছিল সব চেয়ে অগ্রগামী শ্যামবাজারের গাড়িখানার উদ্দেশে। স্কোয়ারের এ মাথায় এসে গোপেনের খেয়াল হল—কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে চারদিকে। মনটা এবার তার ছাঁৎ করে উঠল।

সাইড-কার লাগানো মোটর-বাইকে তিন জন সার্জেন্ট ভট্‌ ভট্‌ করে তাকে অতিক্রম করে লালবাজারে গিয়ে ঢুকল। লালবাজার থেকে লরী-বোঝাই পুলিশ বার হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। খড়ের ঘরে আগুন লাগার প্রথম অবস্থায় পোড়ার মৃদু গন্ধে যেমন মানুষ চমকিত এবং সন্ধানী হয়ে ওঠে—তেমনি ভাবেই সে সতর্ক হয়ে উঠল। একটু ভেবে নিয়ে সে সামনে না এগিয়ে স্কোয়ারের কোণেই যে ট্রামখানা দাঁড়িয়েছিল, সেই-খানাতে গিয়ে উঠে বসল।

কণ্ডাক্টার তার দিকে একবার তাকালে, তার পর মুখ ফিরিয়ে বসল।

গোপেন প্রশ্ন করলে গাড়ি বন্ধ কেন ভাই? ব্যাপার কি?

কণ্ডাক্টার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—এঃ, রক্ত? আপনি বুঝি মাড়িয়ে এলেন?

গোপেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—রক্তে জুতোর ছাপ পড়েছে ট্রামের মেঝেতে। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে—ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের সোলের পাশে জমাট রক্তের কুটি লেগে রয়েছে এখনও। কিছু বুঝতে না পেরে সে কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকালে। মনে হল কণ্ডাক্টার জানে—কথাটা তার মনে পড়ল বিদ্যুতের মত—আপনি মাড়িয়ে এলেন বুঝি?

কণ্ডাক্টার বললে—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—খিদিরপুর থেকে। কি ব্যাপার বলুন তো ভাই?

—স্টুডেন্টস প্রসেসনের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরি পুড়েছে, গুলি চলেছে। ট্রাফিক বন্ধ।

গোপেন নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। সর্বনাশ! কি বিপদ বল দেখি? লরি পুড়েছে, গুলি চলছে, ট্রাম বন্ধ; তাকে যেতে হবে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।

আবার গোপেনকে দাঁড়াতে হল। শুধু দাঁড়াল না, দু'পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। ট্রামের জানলা দিয়ে উজ্জ্বল আলো পড়েছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ! দিনের আলোয় লোকে সভয়ে, সসম্মানে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় নি। রাত্রের অন্ধকারে দু'-চারটে পা পড়েছে। তার মধ্যে একটা ছাপ তার পায়ের স্যাণ্ডেলের। হেঁট হয়ে দেখলে গোপেন। গোঁ-গোঁ করে পুলিশের লরী যাচ্ছে। শিউরে উঠে গোপেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল; তারপর হন-হন করে চলতে আরম্ভ করলে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। সে কি এখানে? গির্জের মাথার ঘড়িতে বাজছে পৌনে দশটা।

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক চোখে আতঙ্ক, অন্য চোখে উত্তেজনা; এখনি মানুষের চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠছে—পরমুহূর্তেই চোখে উত্তেজনার ঝিলিক খেলে যাচ্ছে; হাত মুঠি বেঁধে উঠছে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হন-হন করে চলছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে। সামনের দিকটা যতদূর সাধ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কোথাও পুলিশ কি সার্জেন্ট রয়েছে কি না? কান সজাগ করে রেখেছে—লরি কি মোটর-বাইকের শব্দ শুনলেই গলিতে ঢুকতে হবে—অথবা কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

নভেম্বর মাসে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। সে জানে—যেতে যেতে ওরা ধাঁই করে গুলি ছুঁড়ে দিয়ে যায়। যে মরল—সে মরল। রাস্তার মোড়ে—বিশেষ করে বড় রাস্তার মোড়ে—থমকে দাঁড়াতে হবে। মোড় ফিরবার আগে—উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে—ওদিকে কি ব্যাপার চলছে—তারপর হয় পিছিয়ে আসতে হবে অথবা দ্রুতগতিতে সেই রাস্তায় পড়ে এক ধার ঘেঁষে চলতে হবে।

গোপেনের বন্ধু বীরু রসিক লোক; থিয়েটার নিয়েই মেতে আছে, সে বলেছিল—"মোড়ের মাথায় এসে স্রেফ নাকটি আগে বাড়িয়ে দিবি। স্রেফ নাকটি। নাকের পাশ দিয়ে বাঁকা চোখে দেখবি। তারপর একবার হাতখানি বাড়াবি! তাতেও যদি বন্দুকের আওয়াজ না শুনিস, তখন আর একবার ভাল করে দেখে, সট্। সাঁ করে বেঁকে—সন সন করে একদম হাওয়া।"

কথাটা রসিক বীরুর মুখে বেশ লেগেছিল সেদিন। আজ সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউর মুখে এসে কথাটার চেহারা পালটে গোপেনের মনে উদয় হল। থমকে দাঁড়াল গোপেন।

সামনে বউবাজার সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ জংশন। চৌমাথায় চারটে আলোর ছটা পড়েছে।

পুলিশ-লরি দাঁড়িয়ে আছে। বউবাজারের দু'দিকের ফুটপাত ফাঁকা ; দু'দিকের দোকান-পাট -অধিকাংশই কাঠ-কাঠরার দোকান--সব বন্ধ। সাড়ে দশটায় অবশ্য সর্বদিনই দোকান-গুলি বন্ধ থাকে--কিন্তু দোকানের গায়ে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানগুলো খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের সামনে দু'চারজন বসে থাকে, বেকার এবং রসিকের দল গুলতান করে। আজ বিড়ি সিগারেটের দোকানও বন্ধ। রাস্তার গ্যাসপোস্ট—ট্রামের পোস্টগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ভট-ভট শব্দ উঠছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে এক একটা জোরালো আলোর ঝাঁটার মত ছটা—রাস্তার জংশনের উত্তর-পশ্চিম কোণের বাড়িটার গায়ে পড়ে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখী হচ্ছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সার্জেন্টের মোটর-বাইক বউবাজারে—পশ্চিমমুখে মোড় ফিরছে নিশ্চয়। চঞ্চল হয়ে উঠল গোপেন : আলোটা এইবার তার উপর পড়বে। হঠাৎ সে আতংকে চমকে উঠল! দু'টো বাড়ির মাঝের একটা সরু বন্ধ গলির মুখ থেকে দু'জন লোক তীরের মত ছুটে বেরিয়ে তাকে অতিক্রম করে তারই পাশের উত্তরমুখী একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল গোপেনের।

দুম—দুম—দুম। বন্দুক বা পিস্তলের আওয়াজ হচ্ছে কোথাও। ওদিকে আলোটা তার পাশে এসে পড়েছে। গোপেন মুহূর্তে পাশের ঐ উত্তরমুখী গলিটাতে ঢুকে গেল।

অন্ধকার গলি-পথ—অনেকটা দূরে দূরে এক-একটা গ্যাস জ্বলছে। গোপেন নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একটু আগেই একটা বাঁকের আড়ালে সেই লোক দু'টি দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে বিচিত্র ভীত এবং ভয়াল পলকহীন দৃষ্টি।

তাদের সামনে পড়ে চমকে দাঁড়িয়ে গেল গোপেন। কে এরা, হাতে ছুরি নেই তো? লোক দু'টি আঙুলের ইশারা করে মৃদুস্বরে বললে—চলে যাও। গলি গলি চলে যাও। দাঁড়িয়ো না।

গোপেন ছুটতে লাগল।

—আস্তে। এত জোর পায়ের শব্দ করো না।

আবার দাঁড়িয়ে গোপেন পিছন ফিরে দেখলে। লোক দু'টি এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। লোক দু'টির হাতে কি?

ট্রামের পথের পাথর। স্টোন ব্যালাস্ট।

অবাক্ হয়ে গেল গোপেন। গুলির উত্তরে এরা ঢেলা ছুঁড়ছে। এরা পাগল নাকি?

দুম দুম। পিস্তলের আওয়াজ হল বউবাজারে।

লোক দু'টি আবার গলিতে ঢুকে পড়েছে দ্রুতপদে।

গোপেন ছুটল আবার সভয়ে। গলি-পথ যে দিকে চলেছে—সেই পথে চলেছে সে। ছুটে চলার গতিবেগে হঠাৎ সে গলির মোড় ফিরে একেবারে আলোকিত প্রশস্ত রাজপথের উপর এসে পড়ল।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ।

সামনেই রাস্তার ওপর ধোঁয়া এবং আগুন। মিলিটারি ট্রাকে আগুন জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশে জনতা। আগুনের লাল্‌চে আলোর আভা পড়েছে সকলের মুখের উপর। জ্বলন্ত মিলিটারি ট্রাকটার সামনে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত জনকয়েক মিলে কি যেন টেনে নিয়ে আসছে। ডাস্টবিন—ময়লা-ফেলা হাতগাড়ি--কোথা থেকে কার একখানা মাল-বওয়া ঠেলাও নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি সাজিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। ব্যারিকেড তৈরী করে রাস্তা বন্ধ করছে।

--আসছে—আসছে। দূরপ্রসারী প্রখর উজ্জ্বল দুটো আলো--সংগে সংগে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মত মোটরের আওয়াজ।

ঢুকে পড়ল গোপেন গলির মধ্যে।

আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। পা দুটো ভেঙে পড়ছে। চোখ ফেটে কান্না আসছে। অন্ধকার গলিপথে ঘুরে ঘুরে উত্তরমুখে চলেছে। কিন্তু এখনও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পার হয়ে

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দিকে আসতে পারে নি।

হ্যারিসন রোড ও এ্যাভিনিউ জংশনে দু'খানা লরী এখনও জ্বলছে। গুর্খা পুলিশ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট পাহারা দিচ্ছে ওখানটায়।

হ্যারিসন রোড পিছনে ফেলে অনেকখানি উত্তরমুখে এসে সে আবার একবার চেষ্টা করলে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ পার হবার ; স্থানটা বেশ নির্জন। একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে দেখে, সে একছুটে এপারে এসে পড়ল। একটু আগে পূর্বমুখী একটা গলি। গলিতে ঢুকে সে একটা বাড়ির সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল। একটা বিড়ি ধরালো। এবার ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই শীত ফুরিয়েছে, তার উপর এই ছুটোছুটি, এই উৎকন্ঠা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তেলচিটে ময়লা রুমালখানা বার করে সে মুখ মুছলে। এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে সে মন্থর পদক্ষেপে চলতে চলতে উৎকণ্ঠার পরিবর্তে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল।

মিটিং আর প্রসেসন। প্রসেসন আর মিটিং। দিল্লী চলো,—জয় হিন্দ—বন্দেমাতরম—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—ভারত ছাড়ো। চিৎকার—চিৎকার আর চিৎকার। গুলি খাচ্ছে, মরছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কলকাতার পিচের রাস্তা।

—ওদের আছে বন্দুক, ওদের আছে পিস্তল—পুলিশের হাতে লাঠি—গুলি চালাচ্ছে—লাঠি মারছে। বন্দুকের ডগায় আছে সংগীন। মারছে খোঁচা। কুকুরের মত মারছে! মার—মার—মার—মেরে নে। সাধ মিটিয়ে মেরে নে! ভগবান আছেন।

পথের পাশের একটা ঘড়িতে ঘন্টা বাজার আওয়াজ হচ্ছে।

এক—দুই—তিন—সাত—আট—দশ—এগারো—এগারোটা বাজল।

শহরের এ দিকটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়েছে সব।

ফট—ফট। দুম—দুম। নিস্তব্ধতার মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে গুলি চলার শব্দ এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। এখনও চলছে গুলি। ঢেলার বদলে গুলি। হে ভগবান্!

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার পরিসর রাক্ষুসে হাঁয়ের মত। ওখানে গিয়ে পড়লে আর পাশ কাটাবার জায়গা নেই। নিশ্চয় সেই গোল জায়গাটায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গুর্খা পুলিশ ফিরিঙ্গী সার্জেন্ট। ওটা একটা হাঙ্গামার ঘাঁটি। নভেম্বর মাসে ওখানে গুলি-চলা গোপেন স্বচক্ষে দেখেছে।

সে শিউরে উঠল—সংগে সংগে অকারণে—নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যরাত্রির জনহীন নিস্তব্ধ রাজপথ ধ্বনিচকিত করে চীৎকার করে উঠল—আ—হা-হা-হা। নিজের জানুর উপরে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলে।

গলি-পথে খানিকটা এসে সে বড় রাস্তাটা পার হল। নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট। ছোট রাস্তা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ে সে নিশ্চিন্ত হল।—শা—লাঃ!

মাঝরাত্রির কলকাতার পথ অত্যন্ত বিশ্রী। গা ছম ছম করে। কোথাও জনমানব নেই, দু'পাশের বড় বড় বাড়িগুলোর দোর বন্ধ—জানলা দিয়ে দেখা যায় ভিতরে থম থম করছে। লাইট-পোস্টের মাথায় গ্যাস-বাতিগুলো স্থিরভাবে জ্বলছে ; ওতেই যেন ভয় বেড়ে যায়।

দু'জন লোক! সতর্ক হল গোপেন। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে কি করছে? পরক্ষণেই তারা রাস্তার দিকে ফিরল। গোপেন উল্টো মুখে চলে গেল। দু'জন অল্পবয়সী ছেলে : ছেলে নয়—কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে। আবছা চিনতেও যেন পারছে ওদের। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলে, খবরের কাগজে লাল কালির মোটা হরফে কিছু লিখে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে বেড়াচ্ছে।

কেয়াবাৎ রে বাবা! বহুৎ আচ্ছা ভাই। ঠিক আছে এরা। রাত্রে ঘুম নেই, বুকে ভয় নেই, কাগজের উপর লাল কালির হরফে কথার আগুন জ্বালিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলেছে। কাল সকালে যে পড়বে তার বুকে লাগবে। কি লিখেছে?

"বিপ্লব—বিপ্লব।

বিপ্লবের প্ল্যান চাই ; মন্ত্রিত্ব নয়।

লক্ষ প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত ; নেতৃত্ব কই ?"

অস্বস্তি বোধ করল গোপেন। সে দ্রুতপদে চলতে লাগল। একটু আগেই তার বাড়ি।

ঢং।

কোন বাড়ির ভেতর ঘড়ি বাজছে। বোধহয় একটা বাজছে।

ঢং।

পানওয়ালার বন্ধ দোকানটার মধ্যে ঘড়ি বাজছে।

ঢং।

মিষ্টিওয়ালার দোকানের ঘড়ি এটা।

নিজের বাড়িতে বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লে সে।

পাশের বড় বাড়িতে ঘড়িটায় এতক্ষণে একটা বাজল—ঢং।

– নেবু! নেবু! এই নেবু!

গোপেনের মেয়ের নাম নেবু। ঘুমিয়েছে না মরেছে সব। ছেলেগুলো ঘুমোতে পারে—ছেলেমানুষ—ভাবনা-চিন্তা তাদের হবার কথা নয়। কিন্তু শান্তি ঘুমোলো কি করে? রাত্রি একটা বাজল, কলকাতার পথে গুলি চলছে সন্ধ্যে থেকে—খবর নিশ্চয় পেয়েছে—তবু সে ঘুমোয় কি করে?

প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়লে গোপেন। চিৎকার করে ডাকলে—শান্তি! এই নেবু!

যাক—উঠেছে। দাঁতে দাঁত টিপে—হাতের চড় সে ঠিক করে রাখলে। খুলে দিক দরজা।

দুই

রাত্রি দুটোয় শুয়ে ভোর ছ'টায় ওঠা। বেঙ্গল টাইম ছ'টা—স্বাভাবিক ভাবে ঘুম ভাঙে নি ; ঘুম ভাঙিয়ে দিলে স্ত্রী। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, তবে ঘুম ভাঙল।

ছেলেগুলো তার আগে থেকেই চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ঘুমের পাতলা ঘোরের মধ্যে দূরের আওয়াজের মত কানেও আসছিল, খোলা জানলা দিয়ে সকালের আলোও লাগছিল চোখের বন্ধ পাতার উপর, কিন্তু তার ক্লান্ত চৈতন্যের উপর শব্দের আহ্বান, আলোর স্পর্শ স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি এবং প্রতিচ্ছবিটা তুলে তাকে সজাগ করতে পারে নি। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর অবস্থা ঢিলে হয়ে পড়া তারের যন্ত্রের মত ; অযত্নে পড়ে থাকার ফলে মাকড়সার জালে ঢাকা ক্যামেরার লেন্সের মত। যে প্রয়োজন-মত বিশ্রামের তৃপ্তি এবং পুষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রী সুস্থতা এবং পরিমার্জনা লাভ করে—সে বিশ্রাম তার তখনও হয় নি। তার গায় হাত দিয়ে স্ত্রী ডাকলে—"ওঠ। শুনছ। ওঠ।"

অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়া এই মেয়েটা। কাল রাত্রে এক চড় খেয়েছে। আবার চড় খাবার জন্য ঝুঁকে মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে তাকে ডাকছে। চড় মারবার জন্যে তার অন্তরের প্রবৃত্তি গর্তের মধ্যে খোঁচা-খাওয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল।

—"ওঠ। সবাই বলছে ট্রাম বন্ধ। হেঁটে আপিস যেতে হলে—"

—"ট্রাম বন্ধ?" এবার ধড়মড় করে উঠে বসল গোপেন।

—"কে বললে?"

—"কানু বলছে।"

—"কানু?"

—"হ্যাঁ, আমাদের বিলাসবাবুর ছেলে কানু।"

কানুর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না গোপেনের কাছে। শুধু গোপেন কেন- এ পাড়ায় কানুর পরিচয় কারুর কাছেই দিতে হয় না ; কানু এ পাড়ায় বিখ্যাত, আপনার পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোপেন বলতে চেয়েছিল—কানু যখন বলেছে তখন খবর খাঁটি সত্য।

এখান থেকে খিদিরপুর ডক। অন্ততঃ স্ট্র্যাণ্ড রোড—আপিস পর্যন্ত। তার পর

আপিসের লরি আছে। অন্ততঃ সুপারভাইজার ফিরিঙ্গী সায়েবের টু-সীটার মোটরটার পিছনে ক্লীনার সীটটা আছে।

গোপেনের মনে জেগে উঠল সুদীর্ঘ পথ, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রের রাস্তার অবস্থার কথা। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিজের ছেলেগুলোর উপর। বড় দুটোতে একটা তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে বাড়ির সামনে পথের উপরেই মুভমেণ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সেদিন নেতাজীর জন্মদিন আর স্বাধীনতা দিবস—২৩শে জানুয়ারী আর ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে ন্যাকড়া কেটে রঙ করে—সেলাই করে জুড়ে পতাকাটা তৈরি করেছিল সে আর শান্তি। এখন সেইটে ঘাড়ে নিয়ে বড় দুটো চিৎকার করছে—জয় হিন্দ্। ব—ন্দে—মা—তরম্। জয় হিন্দ্।

পিছনে থেকে ছোটগুলো সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

গোপেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড আক্রোশে এগিয়ে এসে বড় ছেলেটার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।—"হারামজাদা—শুয়ার—বদমাস!"

তার পর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে—এখনি তার সঠিক খবরের প্রয়োজন। জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে; মাল নামছে। না গেলে চাকরি থাকবে না। চাকরি গেলে আর হবে না। ট্রামের মান্থলি, সুবিধা দরে র‍্যাশন—চল্লিশ টাকা মাইনে। গেলে আর হবে না।

* * * *

আশ্চর্য!

বাড়ির দোরে রোয়াকে বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেগুলো নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে!—জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! ব—ন্দে—মা—তরম্!

জয় হিন্দের খুদে পল্টন। গোপেনের বস্তীর হাঁপানীর রোগী বুড়ো ধরণী চাটুজ্জে আবার এদের নাম বার করেছে—জয় হিন্দের কাঠবেড়ালী। রামায়ণ অবশ্যই পড়েছে গোপেন: সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধবার সময় কাঠবেড়ালীদের কাহিনীটুকু খুবই চমৎকার, কিন্তু তবুও এই নামকরণের জন্য গোপেনের আগে রাগ হত: মনে হত জয়হিন্দ্ শব্দটিকে, সঙ্গে সঙ্গে জয়হিন্দের পবিত্র মহান্ চেষ্টাকে বুড়ো ব্যঙ্গ করছে। আজ সে দাঁতে দাঁত ঘষে বার বার ওই নামটাই উচ্চারণ করলে মনে মনে। ঠিক নাম দিয়েছে বুড়ো!

বড় রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা। দাঁড়িয়ে শোনবার অবকাশ নেই গোপেনের, শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্যন্ত না গেলে তার প্রয়োজনীয় সঠিক খবর মিলবে না। কিন্তু না শুনেও সে বুঝতে পারছে জটলায় কি জট পাকাচ্ছে তারা। স্বাধীন ভারতের দল খুব তড়পাই চালাচ্ছে। চালাক। কারও বাপের পয়সা আছে, কেউ বেকার। কর, তোমরা ভারত স্বাধীন কর। গোপেনকে তোমরা বাদ দাও। গোপেনের সঙ্গে তোমাদের কারু মিল নেই। আদার ব্যাপারীর চেয়েও সে হীন ব্যক্তি, তবু তাকে জাহাজের খবর রাখতে হয়। তাকে যেতে হবে স্ট্র্যাণ্ড রোড, খিদিরপুর, ট্রাম চাই তার।

ট্রাম বন্ধ।

বাসগুলো এসেছিল—সেগুলো সামনে 'গ্যারেজ' বোর্ড টাঙিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানগুলো বন্ধ। পাঁচ মাথার ফুটপাথে এরই মধ্যে লোক জমেছে। মজা দেখতে এসেছে সব। দেখ—মজা দেখ! তরি-তরকারির বাজার বন্ধ করবার সুর উঠেছে। যে যা পারছে সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হঠাৎ একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসল। এরাও দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। দোকান গোপেনের চেনা, গোপেনকেও ওরা চেনে। গোপেন নিজের র‍্যাশন থেকে কিছু-কিছু চিনি সরবরাহ করে থাকে ওদের। চিনি খেতে মিষ্টি—এবং পুষ্টিকর, উপাদেয় ও উপকারী দুই-ই বটে কিন্তু সে খাওয়ার ভাগ্য

গোপেনের নয়। কোম্পানীরূপ চিন্তামণি চিনি যোগায়, ভাগ্যহত গোপেন সেই সস্তা-দরের চিনি এখানে চড়া দামে দিয়ে কিছু আয়বৃদ্ধি করে নেয়।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে বললে—এক কাপ চা দিও তো।

—চা?

—হ্যাঁ। এখনও চা খাই নি। দাও।

খবরের কাগজ। এই এক জঞ্জাল। ভোরে উঠেই লোককে জানিয়ে বেড়াচ্ছে—এই হল—এই হল—এই হল; এখন তোমরা এই কর—এই কর—এই কর। জাহাজ বোঝাই করতে হয় না; কাগজে লিখে দাও ফেলে, সীসের অক্ষর সাজিয়ে—কালি মাখিয়ে—দাও ফেলে কলে—বাস, হাজার হাজার ছাপা হয়ে গেল; তার পর—জোর খবর বাবু, কলকাতায় গুলি চললো রক্তারক্তি কাণ্ড! হাঁকে ভরে গেল গোটা কলকাতা গোটা দেশ। এই যে—মোটা মোটা হরফে ছেপেছে—সোমবার পুনরায় কলিকাতায় নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণ—গুলির আঘাতে একজন নিহত, এগার জন আহত—লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার লাঠির আঘাতে কুড়ি জন আহত; সাতাশ জন গ্রেপ্তার।

সকলের নীচে মোটা মোটা হরফে—কুড়িখানি মিলিটারি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ।

মুহূর্তে তার দৃষ্টির সম্মুখে খবরের কাগজের বুকে পিঁপড়ের সারির মত ছাপা হরফের লেখা মুছে গেল—মিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—আবছা আলোর মধ্যে রাস্তার উপর মিলিটারি ট্রাক জ্বলছে। লাল আলো—তার আভা পড়েছে মানুষের মুখে, চোখের সাদা ক্ষেতে লাল ছটা ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আবার পড়তে আরম্ভ করলে।

"আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির উপর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের সম্মিলিত শোভাযাত্রার উপর মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা এবং অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিস দুইবার লাঠি চার্জ করে। ইহার ফলে কুড়ি জন ছাত্র আহত হয়। সাতাশ জন গ্রেপ্তার হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক আমেদ হোসেন নামক জনৈক যুবকের আঘাত বেশী বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।"

চঞ্চল হয়ে গোপেন এবার তার সাণ্ডেল-জোড়াটার দিকে তাকালে। কিছু আর নজরে পড়ে না। ডালহৌসি থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গলিরাস্তার বুকে লাল রক্তের ছাপ মেরে মুছে গিয়েছে। ধারে—যেন লেগে আছে। হ্যাঁ।

উঠল গোপেন।

অনেকে হেঁটে আপিস চলেছে।

ট্রাম বন্ধ। বাস বন্ধ। রিক্সাও বন্ধ। কাগজেই রয়েছে—ট্রামওয়ে-ওয়ার্কার্স, বাস-ওয়ার্কার্স এবং রিক্সা-মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ ইসমাইল সোমবার রাত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন—এই লাঠি চার্জের প্রতিবাদে সব আজ ধর্মঘট করেছে। হরতাল পালন করবে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার আর কোন উপায় নেই।

পুলিশের লরি চলে চলে গেল একখানা। গুর্খা এবং সার্জেণ্ট। গুর্খারা রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলেছে, সার্জেণ্টদের হাতে রিভলভার।

দাঁতে দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাসন, শাসন, নিষ্ঠুর শাসন, অকারণ নিষ্ঠুর শাসন ছাড়া আর কিছু নেই এই দুনিয়ায়। বারকয়েক নিজের মাথাটা সে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মাথার বড় বড় চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের উপর। সেগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে সে বাড়ির দিকে চলল। ছুটতে হবে! এখুনি ছুটতে হবে। এ আর সহ্য হচ্ছে না।

* * * *

গোপেনের বাড়ির সামনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে নেবু। চোদ্দ-পনের বছর বয়স বোধ হয়। হিলহিলে লম্বা, সবে বাল্য উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পা দিচ্ছে। এখনও ফ্রক পরে থাকে। কাপড় দুষ্প্রাপ্য, তা ছাড়া কন্ট্রোলেও যে দাম কাপড়ের—সে কিনে দিতে নেবুর বাপের সাধ্যে কুলোয় না। মধ্যে মধ্যে মায়ের কাপড় টেনে পরে সে। খানিকটা দূরে আড্ডা বসেছে কানুদের। সতের আঠারো থেকে বিশ বছরের ছেলেদের দল। জোর আলোচনা চলছে। গতকালের ঘটনার আলোচনা।

কানু বলছিল—আমি নিজে ছিলাম সেখানে। নিজের কানে শুনে এসেছি।...কলেজ স্ট্রীটে...প্রতিষ্ঠানে দাশগুপ্ত মশায় এসে সব পার্টিকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন। মায়...লীগ পর্যন্ত এসেছিল। ওদের সেক্রেটারি আর রাঙামিয়াকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।...দাশগুপ্ত বললে—কার কি কথা বলুন! ব্যাপারটা এখন লীগেরও নয়—কংগ্রেসেরও নয়—অন্য কোন পার্টির একার নয়। এখন দায়িত্ব সকলের। সব বললে আপন-আপন কথা, ঠিক হল, আজ সকালে সারওয়ার্দী সাহেব আর দাশগুপ্ত -যাবে পুলিশ কমিশনারের কাছে। দরকার হলে সারওয়ার্দী মিস্টার কেসীর সঙ্গে দেখা করে সোজা জিজ্ঞাসা করবে—নভেম্বরের ব্লাডবাথে কি গভর্ণমেণ্টের তৃপ্তি হয় নি—আরও একটা ব্লাডবাথ কি চান গভর্ণমেণ্ট? চাইলে অবশ্যই দিতে হবে, দেবে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান। তারপর যেতে দেয় ভাল—না দেয় প্রসেশন জোর করে যাবে। লীড করবে সারওয়ার্দী আর দাশগুপ্ত।

কানুর বন্ধুর দল স্তব্ধ হয়ে রইল।

নিতান্ত সাধারণ ছেলে সব। অধিকাংশই ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র, দু-একবার ফেল-করা ছেলেই প্রায় সব, জন-দুয়েক—ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, একজন পাস করে বসে আছে। অবস্থায় নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত, তবে গোপেনের চেয়ে সকলের বাপের অবস্থাই ভাল। এই বস্তীর যে দিকটা ভাল অর্থাৎ পাকা মেঝের সঙ্গে দেওয়ালও একখানা ইটের, চালে যে দিকটায় রাণীগঞ্জের টালি, সেই দিকটায় থাকে ; কেউ কেউ পাকা বাড়ীর বাসিন্দা,—দুখানা ঘর, বারান্দাঘেরা একফালি রান্নাঘর—ভাড়া তিরিশ, তাও যুদ্ধের আগে থেকে আছে বলে। সকালে ঘণ্টাখানেক পড়ে—দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুলে হল্লা করে, বিকেলে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ফুটবলের মাঠে, শীতকালটা ক্রিকেটের আসরে ইডেন গার্ডেনে—সন্ধ্যা আটটার পর সিনেমায় কাটায়। ধারের মধ্যে পরস্পরের কাছে দু-চার আনা ধার—সিগারেট বিড়ির দোকানে কিছু ধার ছাড়া আর কিছুর ধার ধারে না। পর্বে-পার্বণে পুজোগুলি আছে—তার মধ্যে সরস্বতী পুজোটাই ওদের নিজস্ব—তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবই নিজেরা করে, বাকীগুলোয় ভলেণ্টিয়ারী করেই ক্ষান্ত হয়। পাড়ায় পিকপকেট কি চোর কি মাতালকে তাড়া করে, ধরতে পারলে ঠেঙায়, দোকানীর সঙ্গে খরিদ্দারের ঝগড়া হলে তার মীমাংসা করে। মোটকথা কলকাতার গত একশো বছরের অতি সাধারণ, ইণ্টেলেকচুয়াল্‌স্‌দের নীচেকার স্তরে যারা, তাদের ট্র্যাডিশনের অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী। একটা প্রবাদ আছে, উত্তর কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়াড় পাড়ার ছোকরারা বিশ বছর আগেও স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি শুনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিল—লোকটা কি জানি সব বই-টই কি লেখে। বংশকুলুজী আলোচনা করলে দেখা যাবে কানুরা এই এদেরই মাসতুতো ভায়ের ছেলে। তাদের সঙ্গে এদের যে তফাৎ সে তফাৎটা এক পুরুষের বা বিশ বছরের তফাৎ। তেরশো তিরিশ সালের পর থেকে দেশে যে হাওয়া বয়েছে, সেই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে ওরা বেড়ে উঠেছে, বাতাস থেকে রক্তে যেসব উপাদান বা শক্তি অথবা বিষ সঞ্চারিত হয়—তার মধ্যে বিষই হোক আর অমৃতই হোক ; শক্তিই হোক আর অহিতকারী সাময়িক মত্ততাই হোক দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব তাদের পূর্বপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তেরশো তিরিশের পর তেরশো বিয়াল্লিশ তারা চোখে দেখেছে। বিয়াল্লিশ বিপ্লবের সময় বয়সে

ওরা আরও কাঁচা ছিল, এবং ছেচল্লিশ সালের কলকাতা—কলকাতা কেন—সারা দেশ—আর বিয়াল্লিশ সালের কলকাতা এবং দেশেও অনেক তফাৎ ছিল, তখন তারা কাঁচা বয়সে—সেকালের কলকাতায় শুধু সবিস্ময়ে দেখেছে সেদিনের বিপ্লব। মানুষকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে, দলে দলে মানুষকে জেলে যেতে দেখেছে ; মহাত্মা গান্ধী থেকে সুভাষচন্দ্র—শরৎচন্দ্র—জয়প্রকাশনারায়ণ পর্যন্ত, যাঁদের নাম শুনে তারা শুধু ভক্তি করত—তাদের তারা প্রত্যক্ষ চিনেছে সেই সময়ে। তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ দেখেছে, মাটিতে মানুষ মরতে দেখেছে, আকাশে এরোপ্লেন উড়তে দেখেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, পথে মিলিটারি লরির কনভয় দেখেছে, ট্যাঙ্ক দেখেছে, আর্মার্ড লরী দেখেছে, কামান দেখেছে, টমি গান, মেশিন-গান দেখেছে, সাইরেন শুনেছে—বোমা পড়তে দেখেছে, নিজেদের বাড়িতে ঘরে—মেয়েদের অর্ধউলঙ্গ দেখেছে, বাঙালীর মেয়েকে W. A. C. I. সেজে ব্রিটিশ, আমেরিকান, কাফ্রি-নিগ্রো-শিখ-পাঠানদের গায়ে গা দিয়ে ঠোঁটে রঙ মেখে সিগারেট টানতে দেখেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বকাহিনী শুনেছে, সুভাষচন্দ্রের নেতাজী নাম গ্রহণ শুনেছে, তাঁর বাণী শুনেছে—"তোমরা রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" অন্নবস্ত্রের অভাবে নিজেরা নিষ্ঠুর কষ্ট ভোগ করেছে, কালোবাজারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে, অসুখে ওষুধ পায় নি, মিছরি পায় নি, এক পয়সা দামের সিগারেট দু পয়সা তিন পয়সা দাম দিয়েও পায় নি। জয়প্রকাশের জেল ভেঙে পলায়নকাহিনী শুনেছে, তাঁর ধরাপড়ার কাহিনী শুনেছে, লাহোর জেলের নির্যাতনকাহিনী শুনেছে। আবার রাজনৈতিক নেতাদের সগৌরব মুক্তির কথা শুনেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে হাওড়া ময়দানে। বৃটিশ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মতামত শুনেছে, দাম্ভিক চার্চিল সাহেবের পতনের কথা শুনেছে। দীর্ঘ ছ'বৎসরের এই সব ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের এবং মানুষের পরিণতির সুস্পষ্ট রূপ নভেম্বরে দেখেছে, শুধু দেখেছে নয়—কানুরা শেষের দিকে সে শোভাযাত্রার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ছিল। নেতাজী-জন্মদিবস পালন করেছে ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস পালন করেছে। ট্রাম-ধর্মঘট দেখেছে—তাদের ধর্মঘটের বিরাট সার্থকতায় আনন্দ উপভোগ করেছে।

ওদের কাছে এসব ঘটনার প্রভাব এই ভাবের উচ্ছ্বাস—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশ অত্যন্ত সাধারণ প্রবৃত্তির সামিল। এসব ওদের কাছে আর রাজনীতি নামক স্বতন্ত্র কোন তন্ত্র নয়, এ ওদের জীবন-তন্ত্রের সামিল। আজকের শোভাযাত্রার সংবাদ পেয়েও তারা তা উপেক্ষা করবে কি করে?

একজন বললে—তা হলে কোথায় ক'টার সময় একসঙ্গে হব বল?

কানু বললে—দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে শ্যামস্কোয়ারে।

একজন বললে—ও কে।

সবাই বললে—ও কে।

দল ভেঙে গেল।

কানু বাড়ি ফিরছিল। নেবু বললে—সাড়ে দশটায় বেরুবে বুঝি!

কানু দাঁড়িয়ে তার সামনের খানিকটা চুল ধরে টেনে দিয়ে বললে—সে খবরে তোর দরকার কি?

নেবু বললে—তা তো বটেই। "ব্যাটা ছেলে রাজা ছেলে খায় দুধের সর, মেয়েছেলে ছাই ছেলে—।"

—"যায় পরের ঘর।" নেবুর কথাটা কেড়ে নিয়ে কানু ছড়াটা শেষ করে দিয়ে বললে—নিশ্চয়।

ঘাড় নেড়ে নেবু বললে—হুঁ—তা তো বটেই। সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফআলি, তোমাদের পাড়ার কমলাদি, বীণা ঘোষ—এরাও তো ব্যাটাছেলে—না? আহা-হা—কি

আমার সব বীর।

—মারব এক ঘুষি—দাঁত ভেঙে দোব তোর।

—এস না, দেখি! নেবু এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ থেমে গেল, গলির মোড়ের ওপাশে গোপেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

—ভারতের স্বাধীনতা কি রকম যে ভগবান জানেন—কিন্তু আমাদের মত লোকের স্বাধীনতা হল মরণ, বুঝলে বাবা!

কানু চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

নেবু বললে—মা, বাবা আসছেন।

গোপেন হন-হন করে এসে বাড়ি ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে নেবুকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখানে? স্নানের সব দিয়েছিস?

সভয়ে বাপের দিকে চেয়ে নেবু বললে—এত সকালে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এত সকালে! ফের একটা ধাক্কা দিয়ে নেবুকে উঠোনে ঠেলে দিয়ে গোপেন বাড়ি ঢুকে গেল।—তেল-গামছা!

গায়ে-মাথায় জল ঢালবার সময়—বিশেষ করে শীতের দিনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে যায়। মন্ত্র নয়—লোকে বাইরে থেকে কথাগুলো কি বলছে বুঝতে না পেরে ভাবে মন্ত্র পড়ছে। হয়তো 'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ পুণ্যান্যেতানি'—অথবা 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব'—অথবা 'জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান' এমনিধারার কিছু। কিন্তু তা নয়—গোপেন চিৎকার করে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "যে করে পাপ—সে হয় সাত বেটার বাপ ; যে করে পুণ্যি—তার ভাগ্য শূন্যি, তাকে লাগে শাপমণ্যি" —আরও অনেক নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলে। কবিত্ব-শক্তি ওর ছিল এমন নয়—একটুকু মিল করবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই আছে।

আজ সে উঁচু দিকে মুখ তুলে উচ্চ চিৎকারে যা বলে চলেছিল, তার মধ্যে ছন্দ নেই, মিল নেই—জীবনের যে কৌতুক-বোধটুকু রাত্রিতে বিশ্রামের পর সকালে মরসুমী ফুলের মত ফুটে ওঠে তাও নেই। সে বলছিল—মুখ তুলে ভগবানকেই সম্ভবত বলছিল—"মেরে দাও বাবা, মরে যাই, চুকে যাক আপদ। মরণের তো হাজার-দুয়ারী খুলেছ বাবা—ঝড়, বোমা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিমোনিয়া, হার্টফেল, টিটেনাস, মিলিটারি লরি, ট্রাম, বাস, বুলেট, বেয়োনেট, ছোরা-ছুরি, লাঠি থেকে আম-কলার খোসা পর্যন্ত। তাই কর বাবা, কলার খোসায় পা পিছলে ফেলে দাও কংক্রীট-করা ফুটপাথের উপর, নির্ঘাত মাথাটা ঠুকে চ্যালা করে দাও! ব্যাস, ঝঞ্ঝাট মিটে যাক্।"

স্নান শেষ করেও তার ক্ষোভ মিটল না। ভাত হয় নি, বাসি রুটি থাকে ছেলেদের জলখাবারের জন্য ; তাই গিলতে লাগল গুড় দিয়ে।

জেটী-সরকারের স্ত্রী তার অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আজ ট্রাম বাস বন্ধ শুনে অনুমান করেছিল স্বামীকে আজ সকালেই রওনা হতে হবে, তাই সে ছেলেদের রুটি দেয় নি। সকালে মধ্যে মধ্যে ছুটতে হয় গোপেনকে, সেদিন এই ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। রুটি গিলতে গিলতে গোপেন মৃত্যু-কামনার জন্য সাফাই গাইছিল—"লাভ কি বেঁচে? আঠারো আনা লোকসানের বরাত, চল্লিশ টাকা মাইনেতে দশটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত জেটিতে ডকে ঘুরে মর। পঙ্গপালের মত ছেলে। রাস্তার কুত্তার বাচ্চা সব। হবে না?" হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললে—"মা-টা যে নেড়ী কুত্তী।" শান্তি এবার রূঢ় দৃষ্টিতে চাইলে স্বামীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য করলে না গোপেন —সে বলেই গেল—"চাল ডাল বয়ে আনতে হবে আপিস থেকে, কাপড়ের জন্যে যেতে হবে কন্ট্রোলের দোকানে; ঘন্টার পর ঘন্টা থাক শালা দাঁড়িয়ে। তবু তো শালা ব্ল্যাক-আউট ঘুচেছে আজকাল। ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাও বাদুড়ের মত। এক জোড়া স্যাণ্ডেল শালা পাঁচ টাকা। মার ঝাঁটা শালা বেঁচে থাকার মুখে। একটা গুলি আজ যদি বুকে লাগে—"

শান্তির আর সহ্য হল না, সে স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"তুমিও বাঁচবে—আমিও বাঁচব!"

—"কি বল্‌লি?"

শান্তি ভয় পেলে না, সে সরে গেল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল স্বামীর দিকে চেয়ে।

গোপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পর্শ করলে, হাতে থাকে একটা রুপোর তৈরি পলার আংটি, সেটা স্পর্শ করলে দুই ভ্রূর ঠিক মাঝখানটিতে। তারপর হন-হন করে রওনা হল।

* * * *

গলি গলি যাওয়া নিরাপদ। কিন্তু বড় রাস্তায় হয়তো এক-আধখানা মাল-বওয়া লরি মিলতে পারে। ডকে কাজ করে অনেক লরি-ড্রাইভারের সঙ্গে 'জান-পয়চান', মানে জানাশোনা আছে।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ফুটপাথ লোকে ভরে গিয়েছে। একেবারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে! মজা দেখছে সব। দেখ বাবা। গোপেনের মজা দেখবার ভাগ্য নয়। হঠাৎ ঘন্টা বাজিয়ে একখানা এ-এফ-এস মার্কা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি দ্রুতবেগে এসে নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটে রাইমার কোম্পানীর ওষুধের দোকানের পাশে থামল।

কোথায় আগুন? এখানে কোথাও আগুন লেগেছে নাকি?

দাঁড়াল গোপেন।

এ-এফ-এস লরির নায়ক লরি থেকে নেমে এগিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ফায়ার এলার্মের লোহার বাক্সটার দিকে।

হরি—হরি। কেউ বদমায়েশী করে কাচের ঢাকনিটা ভেঙে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এদের হয়রান করার মতলব। আপন মনেই গোপেন বললে—"হুঁ!"

ছেলেগুলো লরিখানার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে সকলের দিকে চেয়ে বললে—"চল ভাই—লরিতে চেপে আমরা যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে যাই।"

চেপে বসল সে। তার দেখাদেখি টপাটপ উঠতে আরম্ভ করলে ছেলেদের দল।—"সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের। চালাও।"

ও বাবা! বিচ্ছুর দল রে বাবা! হল কি?

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য না দাঁড়িয়ে গোপেন পারলে না। চাকরিতে তাকে টানছে, কিন্তু এর আকর্ষণও অদম্য। ভয়ঙ্কর কিছুর ভূমিকা যেন তৈরি হচ্ছে লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে।

একটা ছেলে লরি-ড্রাইভারকে বললে—'ওদিকে তাকাচ্ছ কি! পুলিশ নেই—ভেগেছে। চল—চল।"

এতক্ষণে গোপেনের খেয়াল হল, পাঁচ মাথার মাঝখানে গোল জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—সত্যিই সেখানে একজনও পুলিশ নেই।

লরিটা চলতে আরম্ভ করলে। নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখেই চলেছে। একটু হাসি দেখা দিল গোপেনের মুখে।

* * * *

হাঁটার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে তার। পায়ের ডিমটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে। এক-কালে গোপেন একসারসাইজ করত। প্রথম আরম্ভ করত ধীরে ধীরে, তারপর সর্বাঙ্গের মাস্‌ল্‌গুলো যত শক্ত হত তত গতি বাড়ত তার। হেঁটে চলার মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার।

আপিসের বাবুরা রুমালে বা ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে চলেছে। ওদের দেখলে চেনা যায়। গোপেন খাবার নিয়ে যায় না। ঝুলোয় না। নেহাৎ যদি ক্ষিদে পায় সেদিন দু'পয়সার ছোলা-ভাজা কি ঘুঘনি-দানা আর এক কাপ চা খায়। দোকানের চা নয় ; বড় দোকানের কেৎলি ভরে ভাঁড়ে করে যারা পথের ধারে চা বিক্রী করে—তাদের চা কিনে খায়। দু'পয়সায় এক ভাঁড়।

ফড়েপুকুরের মোড়ে বাদাম গাছটার তলায় এক-দল বাবু দাঁড়িয়ে আছে। গোপেন দেখেই বুঝলে এরা অফিসের বাবু নয়। এরা হল খুচরো দালাল। বড় বড় আপিসের সঙ্গে এদের কারবার আছে, বড় সাহেব বড়বাবুকে খাতির এবং ভয় দুই-ই করে, তোষামোদও করে—তবু দু-এক দিন আপিস কামাই করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গোপেনের আপিসের থিয়েটার-পাগলা বন্ধুটি ওদের নাম দিয়েছে—'স্বাধীন জেনানা'। ওরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাসের ব্যর্থ-প্রত্যাশায়। যদি হঠাৎ মিলে যায় কোনক্রমে—তবে আপিসে যাবে ; নয়তো বাড়ি ফিরে আরাম করে ঘুম দেবে।

ও দিকের মোড়ে অর্থাৎ ফড়েপুকুরের দক্ষিণ মাথায় এক দল ছেলে ট্রাম-লাইনের সদ্য তুলে-ফেলা পাথরের ইটগুলো নিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বলিহারি বাবা! কাঠবেড়ালীরা ব্যারিকেড বানাচ্ছে।

জন-চারেক বড় ছেলে—পনের-ষোল বছরের কিশোর ; হ্যাঁ—ভাল ভাল কেতাবে এদের কিশোরই বলে ; জন-চারেক কিশোর রাস্তার দু'মাথার পোস্টের গায়ে দড়ি বেঁধে একটা পোস্টার টাঙাচ্ছে।

'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই।' 'রসিদ আলির মুক্তি চাই।' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।'

একটা দেওয়ালের সামনে কয়েক জন জমেছে। খুব কৌতুকের সঙ্গে কি দেখছে তারা। তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেনও থমকে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে ব্যাপারটা। এও একটা ইস্তাহার। ইংরেজীতে লেখা।

Make Calcutta—Nay, whole of India Out of Bounds for British Imperialism.

ঠিক হ্যায়। জিতা রহো ভাই!

বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্ কথাটা পড়েই গোপেনের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার অফিসের বড় সাহেবের মুখ! বড় সাহেবের মুখ মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে একজন পুলিশ সার্জেন্টের মুখ। উৎসাহিত হয়ে উঠল গোপেন। শালা! অভ্যাস মত বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

মেতে উঠেছে—ক্ষেপে উঠেছে কলকাতার ছেলের দল। মোড়ে মোড়ে ওদের আয়োজন চলছে। গোপেনের চোখে ওদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। মনে মনে বার বার বলছে—'বহুৎ আচ্ছা—জিতা রহো'!

বিডন স্ট্রীটের মোড়ে এসে—গোপেনের মনটা একেবারে পাল্‌টে গেল। ছেলের দল একটা মোটরকে আটকেছে।

—নামো, গাড়ি থেকে নামো! আজ আর গাড়ি চড়ে যেতে পাবে না।

—আগুন লাগিয়ে দাও! লাগাও আগুন!

গোপেনের বুকের ভেতরটা নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'লাগাও আগুন' ধ্বনিটা বুকের ভেতরে হাজার খিলানওয়ালা ইমারতের মত প্রতিধ্বনি তুলেছে। তার মনে পড়ে গেল—মোটরের সামনে কতবার অতর্কিতে পড়ে সে চমকে উঠেছে, ড্রাইভারের ধমক খেয়েছে, গালাগাল খেয়েছে। কতবার তার জামা-কাপড়ে কাদার ছিটে লেগেছে।

গাড়ি থেকে নামল একটি সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ; বললে—দেখ আমি ডাক্তার। রোগী দেখতে যাচ্ছি। চার-পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। গাড়ি না গেলে কি করে আমি এদের দেখব বল? পায়ে হেঁটে কি দেখা সম্ভবপর?

—ডাক্তার আপনি?

প্যান্টের পকেট থেকে স্টেথস্কোপ বার করলে ভদ্রলোক : বললে, গাড়ির কাচেও

লেখা আছে দেখ!

—কিন্তু আপনি সাহেবী পোশাক পরেছেন কেন?

হেসে ডাক্তার বললে—টাই পরিনি, দেখ, গলায় টাই নেই। তবে নানা ধরনের রোগী দেখি, ছোঁয়াচ বাঁচাতে ঢিলে কাপড়জামায় অসুবিধা হয়।

—আচ্ছা। যান আপনি।

—না। দাঁড়ান।—একজন বললে।

—আবার কি?

—বলুন—বন্দে মাতরম্।

—বন্দে মাতরম্।

—বলুন—জয়হিন্দ্।

—জয়হিন্দ্!

—বলুন—রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—নিশ্চয়। রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—বলুন, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—আচ্ছা, যান আপনি।

ডাক্তার মোটরে চড়ল, চড়বার সময়ে সে নিজেই বললে—বন্দে মাতরম্! জয়হিন্দ্!

প্রত্যুত্তরে ছেলেদের সাড়া দেবার সময় ছিল না। আর একখানা মোটর আসছে।—রোখো—রোখো। হাতে হাত বেঁধে ওরা নিজেরাই ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—নামো—উতারো।

গাড়ির ভিতরে মেয়েছেলে নিয়ে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। হাঁ—লাগাও, এইবার লাগাও, ভাল করে লাগাও! একহাত করে সোনার গয়না, ঝকমক করছে, চুড়ি কঙ্কণ,—কি বলে—কি নাম যেন আর একটা হালফ্যাশানের গয়নার? চুড়, হ্যাঁ চুড়। আরও আছে, নাম জানে না গোপেন! মেয়েদের পরনে শাড়ী জামা ঝলমল করছে; তলহাত রাঙ্গা টকটক করছে, গায়ের চামড়া আপেলের মত চকচকে। চলেছে মোটরে চড়ে। উতার দাও। দাও নামিয়ে! লাগাও আগুন মোটরে। হ্যাঁ—ইয়া। লাগাও!

ভদ্রলোক নেমে বললে—খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি বাপু। দেখছ না—মোটরে মেয়েছেলে রয়েছে।

—ওসব আমরা শুনব না।

—শুনো না, কখনও না। কভি নেহি!

দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ দিক থেকে একখানা গাড়ি আসছে। হুডখোলা মোটর: মোটরের উপর দাঁড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে কারা কি বলছে! পতাকা উড়ছে গাড়িখানায়। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, কংগ্রেস পতাকা! গাড়িখানা পাশে এসে দাঁড়াল।

বন্দে মাতরম্!—জয়হিন্দ্!—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্!—হিন্দু-মুসলমান—এক হোক্।

লেগে গেল মাতন। গোপেনের অন্তর যেন নাচছে!

খানিকটা ক্ষুব্ধ হল গোপেন। পতাকা উড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে যারা এল, তারা ওই মোটরের ভদ্রলোক এবং ছেলেমেয়েদের গাড়িখানা ছেড়ে দিলে: সামনে এগিয়ে যেতে অবশ্য দিলে না, কিন্তু গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিলে। বললে—ওঁরা আমাদেরই মা-বোন—ওঁদের অসম্মান করলে কার অসম্মান হবে? তাছাড়া এভাবে আমাদের কাজ করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের লোকের অসম্মান করে, মোটর পুড়িয়ে ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি হবে না। গত কাল পুলিশ যে উদ্ধত হিংস্র বর্বরতা দিয়ে আমাদের উপর নির্যাতন করেছে—বাধা দিয়েছে—তারও কোন প্রতিকার হবে না। এ বিষয়ে আমাদের কি কর্তব্য স্থির করবার জন্য আমরা আজই বেলা বারোটার সময় ওয়েলিংটন

স্কোয়ারে সমবেত হয়ে মিটিং করব। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেখানে আসবেন। তাঁরা আমাদের নির্দেশ দেবেন। অত্যাচারীর উগ্র দাম্ভিকতার উপযুক্ত উত্তর আমরা দেব। প্রয়োজন হয় আমাদের বুকের রক্তে ভাসিয়ে দেব কলকাতার রাজপথ। পিছু হটব না আমরা। সুতরাং আপনারা এইভাবে কাজ না করে দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে আজ আমরা অগ্রসর হব। দেখি কোন্ শক্তি আমাদের গতিরোধ করতে পারে! চলুন—চলুন—দলে দলে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চলুন। এমন ভাবে পথ বন্ধ করে কোন কাজ হবে না।

বন্দে মাতরম্! জয়হিন্দ্! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ! চলুন, দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছেড়ে দাও; রাস্তা ছেড়ে দাও ভাই। ওঁদের বাড়ি যেতে দাও। যান- আপনারা বাড়ি ফিরে যান। কোন কাজের অজুহাত আজ শুনব না আমরা। যান—ফিরে যান।

মোটর-ড্রাইভার মোটরের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। না হোক যাওয়া—বেঁচে গিয়েছে, খুব বেঁচে গিয়েছে।

হঠাৎ গোপেনের কি হল! সে দুই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।—কভি নেহি! রোখো গাড়ি!

সকলে সবিস্ময়ে তাকালে তার দিকে।

গোপেন বললে—মেয়েছেলেরা গাড়িতে যাক, কিন্তু ও ভদ্রলোককে নামতে হবে। হেঁটে যেতে হবে।

মেগাফোনধারী একজন ভদ্রলোক এ গাড়ি থেকে নেমে বেষ্টনী ভেদ করে এদের গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি নামুন মশায়। আপনাকে হেঁটেই ফিরতে হবে। নামুন—নামুন দেরি করবেন না!

ভদ্রলোক নামলেন। খুশী হয়ে উঠল গোপেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল।

গোপেন চেঁচিয়ে উঠল—জয়হিন্দ্!

ছেলেরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে—জয়হিন্দ্!

গোপেন চলতে আরম্ভ করলে এবার। খুব জোরে হাঁটছে সে।

ছেলেরাও চলছে। একজন চেঁচিয়ে উঠল—চলো—চলো!

সকলে বললে—দিল্লী চলো।

একজন গান ধরলে—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—!

ঠিক হ্যায়। গোপেনও তাদের সঙ্গে গান ধরলে—খুশীসে গীত গায়ে যা।

* * * *

দুধারের দোকানপাট সব বন্ধ।

ইট কাঠ লোহার কলকাতা যেন দাঁতে দাঁত টিপে মুখ বন্ধ করে শুষ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; থম থম করছে। রুদ্ধ মুখ—শুষ্ক দৃষ্টি কলকাতার অন্তরের মধ্যে যা হচ্ছে তারই খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসে রাজপথ বেয়ে চলেছে। মানিকতলার মোড় থেকে লোক চলেছে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

থমকে দাঁড়াল গোপেন। মোড় ফিরল সে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকেই চলল। লরির প্রত্যাশা মিছে। যেতে হবে হেঁটেই। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে অফিস কাছে হবে। গত রাত্রের সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সে বিস্মৃত হয় নি। রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত লরির আগুনের আভায় মানুষগুলির সে মুখ তার মনের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে। তফাৎ শুধু গত রাত্রের সে আতঙ্ক তার আর নেই। গাদাবন্দী বাসন পাথরের মেঝের উপর ঝন্ ঝন্ করে পড়লে অন্য বাসনেও তার সুর বাজে, কিন্তু সে বাসনে যদি জিনিস কিছু থাকে তবে সে ইট-পাথরের মতই শব্দহীন হয়ে পড়ে থাকে। তার বুকের

বাসনে কাল ছিল ভয়ের বোঝা, সকালেও ছিল চাকরির ভাবনার বোঝা—যেন সব খালি হয়ে গিয়েছে। হন্ হন্ ক'রে সে চললো।

ফট-ফট-দুম-দুম!

আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মুখে এসে সে দাঁড়াল। কোন্ দিকে শব্দ উঠছে? উত্তর দিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; গলিতে গলিতে লোক ঢুকে যাচ্ছে। হাঁ—ওই—ওই আসছে লরি। চলন্ত লরির লোহার বেড়ায় বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে—সার্জেণ্ট পুলিশ—গুর্খা পুলিশ।

চমকে উঠল গোপেন।

মাথার উপর থেকে ঠিক তার পাশেই সশব্দে খসে পড়ল কার্ণিশের খানিকটা অংশ, আধখানা ইটসমেত পলেস্তারা। বন্দুকের গুলি এসে লেগেছে ওখানে।

ওই চলে আসছে লরি। ওই!

লোকেরা গলিতে সেঁধিয়ে পড়ছে। গোপেনও ফিরল; কিন্তু হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে ভাংগা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঢুকে গেল মানিকতলা স্ট্রীটের পাশের একটা গলিতে।

সশব্দে লরিটা বেরিয়ে যেতেই উদ্যত হাতে ইটটা নিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে গেল সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

শালাঃ! দাঁতে দাঁত টিপে রইল। ইটখানা লাগে নি। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে।

লোক ছুটছে উত্তরমুখে গ্রে স্ট্রীটের দিকে।

কিছুক্ষণ সে ভাবলে। দক্ষিণ-মুখে টানছে খিদিরপুর ডক। জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। কিন্তু—! উত্তর দিকে লোক দলে দলে ছুটছে। পুলিশ গুলি চালিয়ে এল। তবে কি? ঘুরল গোপেন উত্তরমুখে। ওই যে একটা জনতা!

নীলমণি মিত্র স্ট্রীট সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু জংশন।

জনতার বেষ্টনী ভেদ করে ঢুকল সে। কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ করলে না। যাকেই সে ঠেলে পথ করে নিলে-সে-ই ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে তাকে পথ ছেড়ে দিলে। গোপেনের মনেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না। অবসরও ছিল না। সমস্ত লোককে কাঁধে ধরে পিছনে পাশে সরিয়ে সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি ছেলে। ছেলেমানুষ।

এখনও গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে।

দত্তদের ছেলে। মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন দত্ত।

স্থিরদৃষ্টিতে গোপেন চেয়ে রইল ছেলেটির দিকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে গোপেনের, বুকের ভিতরে একটা আগুনের শিখা পাক খেয়ে ঘুরছে।

একটা ইট এসে মাথায় লাগল। রাস্তার ওপার থেকে কেউ ছুঁড়েছে। শালাঃ! বাঁদিকে কানের ইঞ্চি দুয়েক উপরে। রাস্তার আলোগুলো চরকীর মত পাক খাচ্ছে। বাঁহাত দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বসে পড়ল। হাতের তালুতে ঠেকল যেন আগুন। আগুন নয়-আগুনের মত গরম রক্ত; হাতের তালু ছাপিয়ে কানের দু'পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে। একজন তাকে ধরে নিয়ে গেল পাশের গলির মধ্যে।

এইবার তার যেন সম্বিৎ ফিরল।

রাত্রি হয়ে গেছে। কত রাত্রি বুঝতে পারলে না। নীলমণি মিত্র স্ট্রীট-সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু জংশনে মনোরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহের সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কি ঘটেছে স্পষ্ট তার মনে নেই। আবছা-আবছা মনে পড়ে—লাখে লাখে লোক—ডালহৌসি স্কোয়ার!

একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

লাখে লাখে লোক চলেছে। বহুবাজার স্ট্রীট। মানুষের ধ্বনিতে কলকাতার রাস্তার দু'পাশের ইট কাঠ লোহার তিনতলা চারতলা বাড়িগুলো কাঁপছে, মাথার উপরে দূর আকাশে উড়ন্ত চিলগুলো বোধ হয় চমকে উঠছে, তাদের ছাড়িয়েও ভগবানের দোরে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। মানুষের পায়ে সে কি বল—সে কি স্ফূর্তি জেগেছে! চলেছে তারা—ডালহৌসি স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে যাবে।

হঠাৎ এল একখানা পুলিসের লরি। জনতা ক্ষেপে উঠল। গোপেনই সর্বপ্রথম লাফ দিয়ে গিয়ে লরির কিনারা চেপে ধরলে। তার সঙ্গে আরও কত জন। ভেঙ্গে ফেলবে, পুড়িয়ে ফেলবে লরিখানা। এ কি অত্যাচার! হয়েও যেত একটা কাণ্ড। পুলিস ফায়ার করলে। বুলেট নয়—টিয়ার গ্যাস! ওদিক থেকে নেতারা ছুটে এলেন। কাণ্ড কিছু হল না, কিন্তু টিয়ার গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল গোপেন। চোখে সে কি যন্ত্রণা, নিশ্বাসে সে কি কষ্ট!—আঃ—আঃ—আঃ! কোথা থেকে প্রচুর জল এসে পড়ল গোপেনের মাথায়। বাঁচল গোপেন। উপরে তাকিয়ে দেখলে দোতলা তেতলা থেকে মেয়েরা জল ঢালছেন! আঃ! দীর্ঘজীবিনী হও! জয় হোক তোমাদের। জয় ভারতমাতা!

ভারতমাতার মেয়েদের কিন্তু ভাল করে দেখতে পেলে না গোপেন। সচল জনতার অজগরের দেহের ত্বকের অংশের মত গতির টানে এগিয়ে যেতে হল।

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরেও কিন্তু গোপেনের ক্ষোভ মিটল না। এ যে কি ক্ষোভ—এ যে কি বুকের আগুন—সে অন্যে বুঝতে পারবে না। ভারতবর্ষীয়-বাঙালী—কলকাতার বাঙালী না হলে অন্যে বুঝতে পারবে না। গোপেনের সম অবস্থার লোক হলে আরও ভাল বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি তা গোপেন জানে না—কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতায় আর মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নেই। সেই স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেপে উঠেছে। সে ঘুরল কিছুক্ষণ সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে। মাতামাতি চলছিল সেখানে।

হঠাৎ তার কানে এল কালীঘাটে ভীষণ কাণ্ড চলছে। জগুবাজার হাজরার মোড় সে একেবারে ভয়ানক করে তুলেছে। কংগ্রেসের লরি গিয়েছিল হাঙ্গামা বারণ করতে—লরিখানা পুড়িয়ে দিয়েছে।

গোপেন চৌরঙ্গীর মাঠে মাঠে গাছের তলায় তলায় কালীঘাটের দিকে ছুটছিল। জগুবাবুর বাজারে জোর কাণ্ড-কারখানা চলছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে লরি পোড়ানোর মধ্যে পুরো তৃপ্তি পাচ্ছে না সে। ছুটল দক্ষিণ-মুখে কালীঘাট—কালীঘাট-জগুবাবুর বাজার!

মনে পড়ছে হাজরা রোডের উপর দাউ-দাউ করে আগুন। একখানা লরির পেট্রোল-ট্যাঙ্ক সেই মুহূর্তে ফেটে জ্বলন্ত পেট্রোল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালী-কা রাত, ইয়া—দেওয়ালীর রাত বানিয়ে দিলে। মনে পড়ছে—ওদিক থেকে গুর্খারা বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে বুকে হেঁটে আসছে। মধ্যে মধ্যে গুলির ঝাঁক ছুটে আসছে। মানুষ পড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সের লরি আসছে, সাদা পোশাক পরা দেশী ডাক্তারেরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। জিতা রহো, জিন্দাবাদ ডাক্তার ভাইয়া!

আবছা-আবছা মনে পড়ছে সব। ইটটা কিন্তু জোর হাঁকড়েছে। তখনও রক্ত ঝরছে। শালা ঝোঁক কাটিয়ে দিলে, হুঁশ ফিরে এল।

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই।

ডিপোর ভিতরে ট্রাম পুড়ছে। দেওয়ালী চলছে। মনে পড়ছে আগুন দেওয়া। ডিপোর দেওয়াল টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে সব, হাতে জ্বলন্ত মশাল। মানুষের সর্বাঙ্গটা দেখা যায় না, বুক থেকে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়—জ্বলন্ত মশালের আলোয় লালচে হয়ে উঠেছে। বাখারি, ছোট লাঠির মাথায় মোবিল পেট্রোল দিয়ে ভিজানো জুট-কটন বেঁধে জেলে নিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। একটার পর একটা মশাল পাঁচিলের উপর উঠছে আবার পড়ছে নীচে লাফিয়ে। সে-ও লাফিয়ে পড়েছিল তাদের সঙ্গে।

বেরিয়ে এসে দেখছিল রোশনাই। ধাঁ করে এসে লাগল ইটটা। গলির ভিতর থেকে মাথায় ফোট বেঁধে সম্বিৎ নিয়ে সে ফিরল।

খুব জ্বলছে ট্রাম ডিপো।

একটা ছেলে—গলির মুখ থেকে গান গেয়ে উঠল—

বসন্তে ফুল গাঁথ-লো—আমার জয়ের মা-লা—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

সিনেমার গান। গোপেন গানটাকে সিনেমার গান বলেই জানে। রেডিওতে ঐ গানটা প্রায়ই বাজায়। বহুৎ আচ্ছা ছোক্‌রা! ঠিক গান ধরেছে!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

গাইতে গাইতে ফিরল গোপেন। কালীঘাট থেকে বাগবাজার। কুছ পরোয়া নেই। ভয় নেই; ডর নেই; মুখে—কানের পাশে রক্তের দাগ, গায়ের জামায় রক্ত; হাতে পোড়ানো লরি থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া এক টুকরো লোহা—তা ছাড়া কলকাতা-সুদ্ধ লোকই তো আজ দোস্ত। ক্লান্তিও নেই—আশ্চর্য, পা ভেঙে যাচ্ছে না আজ। হন হন করে সে চলল। ওই গানটা গাইতে গাইতেই সে ফিরল।

কালীঘাট থেকে বাগবাজার! চলো মুসাফের। হুঁশিয়ারী শুধু মিলিটারিকে। লাট সাহেব আজ সন্ধ্যায় নাকি মিলিটারি বসিয়েছে রাস্তায় রাস্তায়; গলি-গলি চলো!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

তিন

সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। এখনও অগাধ ঘুম ঘুমুচ্ছে গোপেন। আজ আর তার স্ত্রী তাকে ডাকে নি। গত কাল গভীর রাত্রে রক্তমাখা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা দগ্‌দগে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ফিরে যে তাণ্ডব সে করেছে, তারপর আর ঘুমন্ত গোপেনকে ডেকে জাগাতে সাহস হচ্ছে না শান্তির। গোপেনের স্ত্রীর নাম শান্তি। কুম্ভকর্ণের ঘুমিয়ে থাকাই ভাল। ঘুম ভাঙালেই সে বেরুবে, এবং আজ বেরুলে সে আর ফিরবে না—এই তার দৃঢ় ধারণা। একদিনে গোপেন কুম্ভকর্ণের মতন ভীষণ হয়ে উঠেছে। ওর এই ঘুম দেখে শান্তির মনে কুম্ভকর্ণের উপমাটা জেগে উঠল—নইলে কাল রাত্রে ধারণা হয়েছিল সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

গোপেনের রক্তমাখা মূর্তি দেখে শান্তি শিউরে উঠেছিল। শিউরে ওঠায় গোপেনের সে কি উল্লাস! সে কি হাসি! হাসি থামিয়ে গান গেয়ে উঠল—আগুন—জ্বা—লা—আগুন—জ্বা—লা।

—ওগো! ওগো! শান্তি ভীত শঙ্কিত হয়ে তাকে ডেকেছিল।

উত্তরে গোপেন গান থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল—জয়হিন্দ্‌! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ! ইয়া!

সুস্থ মানুষ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন শঙ্কিত হয় সকলে, চিরদিনের অসুস্থ মানুষ হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেও সকলে তেমনি শঙ্কিত হয়, বিভ্রান্ত হয় অন্ততঃ। চিরটা কাল গোপেন রাত্রিতে ফিরে শান্তিকে—ছেলেগুলোকে তিরস্কার করে, প্রহার করে; মধ্যে মধ্যে জিনিসপত্র ভাঙে। ফিরবার সময় তার সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে, কোনক্রমে যেদিন সাড়ে ন'টা হয়, সেদিন আগে থেকেই শান্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেদিন গোপেনের মেজাজ হয় দু'ডিগ্রির কাছাকাছি উত্তাপের জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত। সমস্ত কিছু প্রলাপ-চিৎকারের অন্তরালে থাকে তার শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনের বিলাপের সকরুণ পরিচয়। কাল ফিরেছিল রাত্রি দু'টোয়, প্রথমেই শান্তির গালে মেরেছিল প্রচণ্ড এক চড়। তারপর সে এক তাণ্ডব। নিজের কপালে করাঘাত করেছিল,

মৃত্যুকামনা করেছিল ; ঘুমন্ত বড় ছেলেটার গায়ের লেপ খুলে যাওয়ায় সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, তাকে একটা লাথি মেরেছিল। আজ সকালে সে যখন কাজে বেরিয়েছে, তখনও সে নিজের মৃত্যুকামনা করেছে, ছেলেগুলোকে 'রাস্তার কুত্তার বাচ্চা' নামে অভিহিত করে তাদের মৃত্যুকামনা করেছে। শান্তির দিকে যে ক্রুদ্ধ হিংস্র পশুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টি শান্তির চোখের উপর ভাসছে। সেই মানুষ ফিরল সাড়ে আটটার জায়গায় রাত্রির শেষ প্রহরে, কপালে দগদগে ক্ষত, সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ নিয়ে ; আজ তো তার বীভৎস ক্রোধে, উন্মত্ত প্রলাপে, অন্তরাত্মার আর্তনাদে বাড়িটাকে প্রেতপুরী বানিয়ে তোলবার কথা! সে মানুষ এমন উল্লাস নিয়ে ফিরল কি করে? এমন সন্তোষের প্রাণখোলা হাসি হাসে কোন্ জাদুর স্পর্শে? তবে কি সে পাগল হয়ে গিয়েছে?

শুধু হেসেই ক্ষান্ত হয় নি গোপেন, উল্লসিত চিৎকারে জয়হিন্দ—ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেই ক্ষান্ত হয় নি। সে শান্তিকে মিষ্টি কথা বলেছে, সমাদর করেছে, ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশার কথা বলেছে, গুন্-গুন্ করে গান গেয়েছে, এইসব হাঙ্গামা চুকে গেলে একদিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বলেছে, ভেটকি, গল্দা চিংড়ী, মাংস, সন্দেশ—অনেক কিছুর ফর্দ করেছে মুখে মুখে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি গিয়ে মা কালীর পুজো দিয়ে আসবার মানত করেছে। শান্তিকে বলেছে, তাঁতের কাপড় কিনে দেবে। বলতে বলতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তির ঘুম হয় নি। এই পাড়াতেই এক পাগল আছে—সে রাস্তার লোক পেলেই তাকে ধরে বলে—"ওই যে বেলুড়ের রাজা—মহারাজ রামকৃষ্ণের বংশধর—রাজ্য ওদের পাওনা নয়। বুঝলে, মানে স্বত্বদোষ হয়েছে। স্বত্ব হল আমার। এইবার আমি রাজা হব। রাজ্য পেলেই তোমাকে একটা বড় চাকরি দেব। মোটর আমি কিনব না, কিনব এরোপ্লেন আর জুড়িগাড়ি। ঘোড়া—খুব বড় বড় তেজী ঘোড়া। টগো-বগ, টগো-বগ, এই তফাৎ যাও, হট যাও—হট যাও।" বলতে বলতে সে নিজেই ছুটতে থাকে। শান্তি একদিন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকেও সে সবিনয়ে এসে কথাগুলি শুনিয়ে গিয়েছিল। তার কথা ও কল্পনার সঙ্গে গোপেনের কথা ও কল্পনার তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু এক জায়গায়—পাগলের কথা শুনে সে অপার কৌতুক অনুভব করেছিল—প্রাণভরে হেসেছিল। আর গোপেনের কথা শুনে সে নিদারুণ আশঙ্কায় প্রায় শ্বাসরোধী উদ্বেগ অনুভব করেছে ; নিঃশব্দে বাকী রাত্রিটুকু কেঁদেছে।

সকাল বেলায় তাই সে গোপেনকে ডাকলে না। ছেলেগুলোকে চিৎকার করতে নিষেধ করলে। ঘরের জানলা দু'টো শীতের রাত্রে বন্ধই থাকে, সকাল বেলায় খুলে দেওয়া হয়, আজ তাও খুললে না। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

মানুষের শরীরে কত সয়? দুঃখী গরীব হলেও ওরও তো মানুষের শরীর! ঘুমিয়ে সুস্থ হোক্ বেচারী! ঘুমই হল মায়ের কোল। শীতের দিনে গরম, গ্রীষ্মের দিনে বাতাস—মায়ের হাতের স্পর্শ। বড় ছেলেটাকে পাঠাবে বাজারে, ওই গিয়ে বাজার করে আনুক!

* * * *

রাস্তা-ঘাটের এই অবস্থা। গুলি চলছে। এই বস্তীর মধ্যে বাড়িতে বসেও শান্তি খবর পাচ্ছে। ছেলেরা খবর আনছে, প্রতিবেশীরা খবর আনছে, পথে লোক চলছে,—তাদের মুখে এই ছাড়া কথা নেই, পানের দোকানের সামনে এই কথা চলছে, গঙ্গার ঘাটে এই কথার জটলা, আকাশে এই কথা—বাতাসে এই কথা ; আশপাশের বাড়িতে কেউ কাতরে উঠলে মনে হচ্ছে—কেউ বুঝি গুলি খেয়ে বাড়ি ফিরল, কান্নার আওয়াজ শুনলে মনে হচ্ছে—ও-বাড়ির কেউ রাস্তায় গুলি খেয়ে মরেছে, সেই খবর এল বুঝি। এই

বস্তীটায় ঘরে ঘরে মেয়েরা অভিসম্পাত দিচ্ছে। তাদের ভদ্র-গৃহস্থদের পাশেই—ঝি-চাকরের কাজ যারা করে, মজুর খেটে যারা খায়, তাদের বস্তী! এই বস্তী থেকে ঝিয়ের দল সকাল বেলায় বেরিয়ে যায়—কেউ তিন বাড়ি, কেউ চার বাড়ি ঠিকের কাজ করে। এই বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পার হয়ে, নতুন রাক্ষুসে বড় রাস্তাটা পার হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কাজ করতে যায়। ওদিকে হাতিবাগানের মোড় পর্যন্ত, এদিকে খাল-ধার পর্যন্ত, অন্যদিকে কুমোরটুলি আহিরীটোলা শোভাবাজার পর্যন্ত। কাল বিকেলবেলা থেকে কেউ আর কাজে বার হতে পারে নি। গলি-গলি যত দূর যাওয়া যায় গিয়ে বড় বড় রাস্তা যেখানে পড়েছে সেখান থেকেই ফিরে এসেছে ; আজও ভোরবেলায় কয়েক জন বেরিয়েছিল।

এ-পাড়ার জগো মাসীর প্রবীণ বয়স, পাড়ার ঝিয়েদের একটা দলের মুরুব্বী। সে ভোরবেলায় শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর যেতে সাহস করে নি। কালীঘাটের বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায় সেইখানে একটা বড় বাড়িতে লালমুখো গোরা-পল্টন গিস-গিস করছে। দোতলা তেতলার বারান্দায় সারি সারি দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে। রাস্তাঘাট যেন তেপান্তরের মাঠ,—ট্রাম নেই, বাস নেই, গাড়ি-ঘোড়া, রিক্সা—কিছুই নেই ; মিলিটারি লরি—যেগুলো পাড়া কাঁপিয়ে সকালবেলা কারখানার বাবুদের, ফিরিঙ্গী মেমসায়েবদের আনতে যায়, সেগুলো পর্যন্ত আজ বন্ধ। মোড়ের উপর বন্দুক ঘাড়ে করে লালমুখোরা টহল দিচ্ছে। বাজারহাট, দোকানপাট সব বন্ধ। তবুও জগো রাস্তাটা পার হবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক রাস্তার মাঝ-বরাবর গিয়েছে, এমন সময় একটা বিকট আওয়াজ উঠল—হি—।

চমকে উঠে জগো দেখলে—একজন লালমুখো তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে—হি—। একজন তাকে দেখালে বন্দুকটা।

অন্য কেউ হলে সেইখানেই পড়ে যেত। কিন্তু জগো—জগো মাসী বলেই কোন রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছে। তার পালানো দেখে তাদের সে কি অট্টহাসি! এটা আমোদ হল ওদের। জগো বুঝতে পারলে সে-কথা। কিন্তু আমোদ করতে ওরা অনেক কিছু করতে পারে। জগোর মনে পড়ল—বাগবাজারের মাঠে ছেলের দলের ইঁদুর মারার কথা। একটা দোকানের মেঝে থেকে পঁচিশ-তিরিশটা ইঁদুর বেরিয়েছিল—সেগুলিকে ঘিরে ওই মাঠে তাড়া করে তারা ঠেঙিয়ে মারছিল। সে কি আমোদ তাদের! জগো ফিরে এসেছে। যারা যাচ্ছিল, তাদের ফিরিয়ে এনেছে। যারা যাবার উদ্যোগ করছিল, তাদের বারণ করেছে। দল বেঁধে বসে তারা এখন অভিসম্পাত দিচ্ছে। ভগবানকে ডাকছে। বলছে বিচার করো তুমি।—

কাল রাত্রেই নাকি একটা বড় ট্যাঙ্ক এনে শ্যামবাজার বাজারের পিছনে কোথায় রেখেছে। ট্যাঙ্ক দেখেছে শান্তি। রাস্তার উপর দিয়ে যেতে দেখেছে : দুনিয়ায় এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর নেই। বাঘের পা আছে, মুখ আছে, চোখ আছে—হাতীরও আছে, গণ্ডারেরও আছে। কিন্তু এর পা নেই—রাস্তা কাঁপিয়ে—বাড়ি কাঁপিয়ে—বিকট শব্দ করে বুকে হেঁটে চলে—চোখ নেই—সুমুখ নেই—পিছন নেই—বেরিয়ে আছে কামানের নল। ও-ই চালাবে আজ। মানুষের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে ওই রাক্ষুসে পাঁচ মাথার মোড়ে কত মানুষকে চাপা দিলে, তার হিসেব নেই। সেগুলো তবু মোটর—বড় বড় দৈত্যদানার মত আকার হলেও রবারের চাকা। আজ এই কয়েক বছর ধরে ওই এক আতঙ্কের উদ্বেগ নিত্য নিয়মিত ভোগ করে আসছে শান্তি। ছেলেগুলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই উদ্বেগটা জমতে আরম্ভ করে বুকের ভিতর, ফিরতে যত দেরি হয়—তত সে উদ্বেগ বাড়ে। রাস্তায় মানুষ চাপা পড়ার খবর এলেই মনে হয় এবার উদ্বেগে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। গোপেনের জন্য তার এ ভাবনা ছিল না। মনে হয়, বড় ছেলেটা বুঝি চাপা পড়েছে। কিন্তু আজ তার ভাবনা গোপেনের জন্য। কাল রাত্রে সে গোপেনের যে মূর্তি দেখেছে, তাতে সে আজ নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, গোপেন আজ পাঁচ মাথার মোড়ে যাবামাত্র ওই

ট্যাঙ্কটার তলায় পড়ে পিষে—চটকে—রক্তমাংসে হাড়ের কুচিতে ছেতরে রাস্তার পিচের উপর সেঁটে যাবে, পানের দোকানের সামনে পিচে সেঁটে বসে যাওয়া সোডাওয়াটারের বোতলের মুখের পিতলের ঢাকনীর মত, না—ঢাকনীটা বসে গেলেও গোটাই থাকে ; সেঁটে যাবে দুপুরের রৌদ্রে গলা পিচের উপর উড়ে-পড়া শুকনো পাতার মত।

* * * *

জগোর উচ্চ কণ্ঠস্বর এখনও শোনা যাচ্ছে। অভিসম্পাতের ভাণ্ডার তার ফুরিয়ে গিয়েছে বোধ হয় ; কিন্তু আক্রোশ মেটে নি। ভগবানকে বিচার করতে বলছে, কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরসা রাখতে পারছে না। কবে অভিসম্পাত ফলবতী হবে, কবে ভগবান বিচার করে দণ্ড দেবে—তার প্রতীক্ষা করে থাকবার মত ধৈর্যও আর নেই। জগো উচ্চকণ্ঠে বলছে—আপসোস হচ্ছে আমার—ছুটে পালিয়ে এলুম কেনে? গুলি করে মারত—মারত, মরতাম ফুরিয়ে যেত, যন্ত্রণার শেষ হত, খালাস পেতাম।

একজন উত্তর করলে—মরণকে তো ভয় নেই দিদি ; গুলি লেগেও যদি না মরি, একটা অঙ্গ যদি খোঁড়া হয়ে যায়?—ভয় তো সেই।

অন্য একজন বললে—মেরে ফেললে তো চুকে-বুকে যায় মাসী। মুখপোড়ারা যে ধরে নিয়ে যায় গো। বিপদ তো সেইখানে।

তার কথাকেই সমর্থন করে আর একজন বললে—মাগো! বাঁশবুকোরা মোটর গাড়িতে যায় আর ইশারা করে ডাকে। গাড়ি থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়।

—এই সে-দিন! আর একজন বলে উঠল—সে-দিনে সন্‌জে বেলায় ভোলা দাসী কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে—গলিটার মুখে ঢুকবে, পিছু থেকে কেঁউড়ি মেউড়ি শুনে ফিরে চেয়ে দেখে দু'জনা তাকে ডাকছে—পিছু নিয়েছে! ভয়ে ভোলা দাসী দে ছুট। ভোলা দাসীও ছোটে—তারাও ছোটে। খালের ধার—পথে লোকজন নেই, সন্‌জে হয়ে গিয়েছে—কি বেপদ বল দিকিনি? ভোলা দাসীর অদৃষ্ট ভাল, ধরতে পারলে না—তার আগেই গলিতে ঢুকে একটা বাড়িতে সেঁদিয়ে গেল। লোকজন দেখে মুখপোড়ারা সরে পড়ল।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জগো বলে উঠল—চল্‌ কেনে আমরা সব দল বেঁধে যাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলি—লাও, দাগো বন্দুক—মেরে ফেলাও আমাদিগে—লাও—মার—লাও।

* * * *

ঘুমুক, কাল কাজে না গিয়ে এই মাতনে মাতামাতি করে রাত্রির শেষ প্রহরে ফিরেছে। আজও সে আপিস কখনই যাবে না, যাবে ওই মাতনে মেতে ওঠবার জন্যে। চাকরি গেলে এতেই যাবে। তবে প্রাণে না মরে বেঁচে যাতে থাকে তাই করতে হবে শান্তিকে।

বাড়িতে এক টুকরো আলু নেই, একফালি কুমড়ো নেই, শাকের পাতা পর্যন্ত নেই। কাল গিয়েছে হরতাল। বাজার বসে নি। শান্তি নিজেই বাজার করে। গোপেন আপিস গেলে সে যায় গঙ্গার ঘাটের দিকে। পথে বাগবাজারের বাজার। ফুটপাথেও ফড়েরা তরকারি বিক্রি করে। সবই প্রায় দাগধরা জিনিস কিন্তু দরে সস্তা। আজ এখনই—এইক্ষণে বাজার না করলে চলবে না : রান্না চড়বে না। পয়সার জন্য ভাবনা নেই। গত কাল ওই যে বড় বাড়িখানা—ওই বাড়ির ঝি এসে আধ সের চিনি এক সের মুগের ডাল কিনে নিয়ে গিয়েছে। ঝিটা নিজের জন্যে কিনেছে আধপো নারকেল তেল। পয়সা আছে। কিন্তু গোপেনকে বাড়িতে রেখে শান্তির বাইরে যেতে সাহস হয় না। ভালবাসা

ভক্তি—এসবের কথা নয়, কথাটা হল নেহাৎ সাদা কথা, গোপেনের কিছু হলে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? জায়গা অবশ্য পাশেই রয়েছে ওই জগোদের বস্তীর এলাকায়, মেপে দেখতে গেলে তফাৎ মাত্র বিশ হাত, কিন্তু ওই বিশ হাত পার্থক্য অতিক্রম করবার কথা মনে করতেও শান্তি শিউরে ওঠে। ওরা খারাপ লোক বলে নয়, রাত্রে অবশ্য ওখানে অনেক খারাপ কাণ্ডই ঘটে, চেঁচামেচি, মারধর, হল্লা, গালাগাল অনেক কিছু হয়। মেয়েদের অনেকেই খারাপ। তবে তারা বাজারের বেশ্যা নয়, জানা-চেনা লোক দু'চারজন আসে যায়। ওদের পাশেই অনেক গেরস্তও থাকে। বামুন-কায়েত-বদ্যি সব রকম জাতই আছে। বামুনের মেয়েরা সকাল বেলা গামছা ঢেকে থালা নিয়ে ঠিকের রান্না করতে যায়। রোজগারও বেশ করে। বামুনের মেয়ে আধবুড়ী ওই 'টিয়েপাখী'—ও নাকি রোজগার করে মাসে পঁচিশ টাকা। লম্বা হিলহিলে চেহারা টিয়েপাখীর মত নাক আর অনর্গল বকে। পাখীতে যেমন শুনে বুলি বলে, তেমনি ভাবে যে যা বলবে ঠিক সেই কথাটি নিজে একবার বলবে, তাই লোকে ওকে বলে টিয়েপাখী। ঠিক ওই জন্যেই শান্তি ওই টিয়েপাখীর অবস্থার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। সে বেশ জানে, টিয়েপাখী যে ওই ভাবে পরের কথাটি অবিকল বলে যায়, সেটা তার পরকে তোষামোদ করার প্রয়াস। দু'-বাড়িতে ঠিকের রান্না করে মাইনে পায় পঁচিশ টাকা আর তোষামোদে তুষ্ট করে পুরনো কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া জুতো পর্যন্ত সংগ্রহ করে। টিয়েপাখীর একটি মেয়ে আছে, তার স্বামী কাজ করে কারখানায়, মাইনে যা পায় তার অর্ধেক যায় নেশায়। কাজেই টিয়েপাখীকে যোগাতে হয় মেয়ের কাপড় থেকে আরম্ভ করে নাতনীর ফ্রক, জুতো, খেলার জন্য ভাঙ্গা পুতুল পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে চুরিও করে। চুরি করে আনে কয়লা, ঘুঁটে, বাটা মশলা, পান-দোক্তা! ওই দশায় উপনীত হতে শান্তি পারবে না। এই বিশ হাত তফাৎ অতিক্রম করার চেয়ে, বৈতরণীর খেয়া পার হতে সে রাজী। ঘুমুক, গোপেন ঘুমুক।

গোপেন দেখতে কুৎসিত।—আসলে এমন কুৎসিত সে ছিল না, কিন্তু বসন্তের দাগে মুখখানা বিশ্রী করে দিয়েছে। গোপেন যখন রাগে, তখন ওই ক্ষত-চিহ্নে ভরা মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত গোপেনের মুখের দিকে চেয়ে আজ কিন্তু শান্তির মন মমতায় ভরে উঠল। ওকে একটু ভাল খেতে দেওয়ার প্রয়োজন, যত্ন করার প্রয়োজন। ওই তো গোটা সংসারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু যত্ন করবে কখন! বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই মানুষের। শান্তি হঠাৎ উঠল। ডাকলে বড় ছেলেকে—দেবা! দেবা!

দেবুর সাড়া নেই। শান্তি বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গলিটার বাঁক পর্যন্ত দেখল দেবা নেই, মেজ ট্যাবাটাও নেই। সাত বছরের তৃতীয় ছেলে হাবুটা দাঁড়িয়ে আছে বাঁকের মাথায়। শান্তি তাকেই ডাকলে—হাবা! দেবা কই, ট্যাবা কই?

দিগম্বর ছেলেটা অনবরত সর্বাঙ্গ চুলকোচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাবা বললে—মেজ্জা গেল "ডয়হিন্ড" করটে। ডাডাও গেল।

জয়হিন্দ করতে? শান্তির সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ওই মেজ ট্যাবাটা হল তার গর্ভের আপদ। ক্ষুদে শয়তান! ওর জন্যই পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া। পাড়ার ছেলেদের ঠেঙিয়ে আসবে। চোর হয়েছে, চুরি করবে। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠবে, বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে, যার সঙ্গে ঝগড়া তার বাড়ির দরজাটাকে পায়খানায় পরিণত করে দিয়ে আসবে। সরস্বতী পুজোর ভাসান দেখতে চলে গিয়েছিল হাওড়া পোলের ধার পর্যন্ত। শেয়ালদার কাছে মেলা বসে মুসলমানদের পর্বে—সেখানে চলে যাবে। হাতীবাগানে বোমা পড়েছিল, সেখানে গিয়েছিল। তখন তো আরও ছোট ছিল! গ্রে স্ট্রীটে একটা বোমা পড়েছিল—পড়েই সেটা ফাটে নি, পুলিশ থেকে গাড়ি ঘোড়া ট্রাম লোকজন যাতায়াত বন্ধ রেখেছিল—ট্যাবা সেইখানে বসে ছিল সমস্ত দিন। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যায় ফিরে এসে হতাশ ভাবে বলেছিল—বোমাটা ফাটল না!—আপদ! ওটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় আপদ! 'ডাকপুরুষের' কথায় আছে,—'আগলাঙলা যেখানে যায়,

পিছল্যাঙলাও সেখানে ধায়' ; ট্যাবা সে কথাকে রদ করেছে, উল্টে দিয়েছে, ট্যাবা যায় আগে দেবা যায় পিছনে ; ট্যাবাই মাটি করলে দেবাকে। মরুক—মরে তো ট্যাবাই যেন মরে। ট্যাবার খোঁজে মাঝে মাঝে তাকে নিজেকে বার হতে হয়। কিন্তু আজ আর তার বার হবার উপায় নেই। ট্যাবা যায় যাক, দেবাও যদি তার সঙ্গে মরে মরুক, আজ সে গোপেনকে ছেড়ে এক পা নড়বে না। সে ডাকলে—নেবু!

নেবু হল বড় মেয়ে, সব চেয়ে বড় সন্তান। চোদ্দতে পা দিয়েছে, লম্বা হয়ে উঠেছে তার মাথার সমান। ভারী শক্ত মেয়ে। শান্তির সন্তানদের মধ্যে ওই সব চেয়ে সবল—শক্ত। ছেলেবেলায় মেয়েদের খেলাধুলোয় সব-কিছুতেই ফার্স্ট হত। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। কিন্তু মাইনে কোথা থেকে আসবে, বইয়ের দাম কে দেবে? নেবু ঘরের কাজ করে আর বাপের তাড়ায় গান শেখে। কোন্ কালে গোপেন একটা হারমোনিয়ম পেয়েছিল লটারিতে, সেটা ভেঙে এতদিন পড়ে ছিল—হঠাৎ একদা গোপেন সেটাকে মেরামত করিয়ে এনে নেবুকে দিয়েছে। বলেছে—গান শেখ। মধ্যে মধ্যে নাচ শিখতেও বলে। গোপেনের ধারণা—নাচ-গান জানলে বিয়ের পক্ষে সুবিধে হবে। শান্তি ডাকলে—নেবু!

—বাসন মাজছি।

—থাক বাসন, আমি গিয়ে মাজছি। তুই শোন।

নেবু এসে দাঁড়াল। একটা হাফ প্যান্ট আর বাপের ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করেছে। শান্তির চোখে ওটা খুব লাগে না, দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তি বললে—তুই আজ বাজারটা করে নিয়ে আয়।

—বাজার?

—হ্যাঁ। একটা আলু পর্যন্ত নেই। দেখ, এই বাগবাজারের বাজারে কি পাস, নিয়ে আয়। ভাল দেখে চিংড়ী আনবি একপোয়া। তোর বাপ চিংড়ী খেতে ভালবাসে। আমার কাপড়টা পরে নে। একফালি কুমড়ো, একপো আলু। একটু বড় দেখে আনবি। গলদার দর বেশী—বড় বাগদা আনবি বরং। আর পথে যদি ট্যাবা-দেবার দেখা পাস—তবে ধরে নিয়ে আসবি। বলবি—মা বলেছে মুখে রক্ত তুলে দেবে আজ। তাতে না শোনে—তবে একটা পথের পাথর তুলে কপালে মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবি—আমি তোকে বলছি—ফাটিয়ে দিয়ে আসবি।

অত্যন্ত সাহসী মেয়ে নেবু আর এই ধারার কাজে ভারী খুশী হয় সে। ব্লাউজ তার নেই, আছে গোটা দুয়েক খাটো ফ্রক। সেই ফ্রকটাই পরে তার ওপর পরলে সে মায়ের কাপড়খানা। বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরল সব চেয়ে ছোট ভাইটাকে টানতে টানতে। বছর তিনেক বয়স ওটার, ওটার বাতিক হল সিগারেটওয়ালার দোকানের সামনে থেকে লেমনেড সোডার বোতলের মুখের টিনের ঢাকনী সংগ্রহ করা। বললে—নাও এটাকে। ট্যাবা আর দেবা শুনলাম পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছে। লরি পোড়াতে গেছে।

নেবু আবার চলে গেল।

শান্তির ইচ্ছে করছিল এই ছোটটাকেই মেরে খুন করে ফেলে। কিন্তু না,—চিলের মত চেঁচাবে। গোপেনের ঘুম ভেঙে যাবে।

উনোনের আগুনটা দেখতে হবে। চায়ের বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখতে হবে। পোয়াটাক চিনি এখনও আছে ঘরে—খানিকটা ভিজিয়ে রেখে দেবে, সারারাত জেগেছে, একটু শরবৎ খেলে শরীরটা ঠান্ডা হবে। আহা রে, বড় ভুল হয়ে গেল, অন্ততঃ একটা নেবুর জন্য বললে হত। অনেক দাম!—অন্ততঃ চার পয়সা। কিন্তু তার মেয়ে খুব চালাক, একটা নেবুর পয়সা লাগত না। নেবু-লঙ্কা-আমড়া এসব সংগ্রহে নেবুর নিপুণতা অদ্ভুত।

জগো এখনও চিৎকার করছে।

শান্তি দু'হাতে দু'টো গেলাস নিয়ে একটা থেকে অন্যটায় শরবৎ 'ঢাল-উপুড়' করে—চিনিটাকে গলিয়ে ফেলছিল। উনোনটা ধরে উঠেছে। শরবৎটা রেখে এইবার ডাল চড়িয়ে দেবে। একটা গোলমাল শুনে সে চমকে উঠল। হাতের কাজ তার বন্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলে। অনেক লোক একসঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। গেলাস দু'টো নামিয়ে রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গলির মোড়ে। একদল লোক বেরিয়ে গেল। জয়হিন্দ্—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লাগ গিয়া রে বাবা। চলো মুসাফের।

সামনে রহমান সেখের বিড়ির কারখানা। রহমান দোকান বন্ধ করেছে। রহমানকে শান্তি চেনে, কিন্তু কথা বলে না। শান্তি মিনিট খানেক দ্বিধা করলে, তারপর সে রহমানকে ডাকলে—কি হয়েছে বলুন তো?

রহমান ফিরে তাকিয়ে শান্তিকে কথা বলতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে না; উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললে—শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় গুলি চালিয়েছে।

—গুলি চালিয়েছে? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায়?

—হ্যাঁ; সাত-আট আদমী গিয়েছে।

—আমার ট্যাবা-দেবা—

রহমান যেতে যেতে বললে—দেখব আমি। ট্যাবা খুব হুঁশিয়ার আছে, আপনি ভাববেন না। সে চলে গেল।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল। গোপেনকে সে ডাকবে না। ছেলে দু'টো—হাবু আর সাবুটা থাকল, থাক্। তাকে যেতেই হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সাত-আটটা লোক পড়েছে, তার মধ্যে ট্যাবা আর দেবা নিশ্চয় আছে। ট্যাবা হয়তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে, দেবা যে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই; দেবা বোকা। তার বুদ্ধি কম। ছুটল শান্তি।

দেবা কি ট্যাবা যদি মরে থাকে তবে শান্তি আজ সামনে পেলে ওদের উপর লাফিয়ে পড়বে। মারুক—ওকেও তারা গুলি করে মেরে ফেলুক।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা।

ফুটপাথ ঘিরে চারিপাশে জনতা। এত মানুষ—তবু স্তব্ধ। রাস্তাটা ফাঁকা, জনশূন্য পিচ পাথরের পথ মানুষ-ভাসিয়ে-নিয়ে-যাওয়া নদীর মত ভয়াল মনে হচ্ছে। ফুটপাথের জনতা পাড়ের মানুষের মত—ওই তরঙ্গে ঝাঁপ দেবে কিনা ভাবছে।

উত্তরে পুলিশ ব্যারাকটার বারান্দায় সাদা মানুষগুলো ঝুঁকে দেখছে। সম্ভবতঃ ঘৃণা আক্রোশ এবং ক্রোধ-পরিপূর্ণ অন্তরে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কালা আদমীদের।

শান্তি ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে চার দিক চেয়ে দেখছিল। কোথায় দেবা-ট্যাবার গুলি খাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর—গল-গল করে রক্ত বার হচ্ছে গুলির ছিদ্র দিয়ে!

কে তার কাপড় ধরে টানলে পিছন থেকে।

—কে রে? কে রে শয়তান—হারামজাদা—

—আমি। নেবু।

—নেবু!

—হ্যাঁ।

—তুই এখানে?

—চারটে লোককে গুলি করলে এক্ষুণি। আমি দেখলাম।

—চার জন?—দেবা—ট্যাবা?

—তারা এখানে নেই। আমি ওদিকের বাজারে যাই নি এখানে এসেছিলাম। বললে—গোরা পল্টন এসেছে। তাই—। নির্ভয় হাসি হাসলে নেবু।—চল বাড়ি চল।

—দেবা-ট্যাবা নেই এখানে? যারা গুলি খেয়েছে তাদের তুই দেখেছিস?

—হ্যাঁ। একজন সারকুলার রোড থেকে আসছিল—কাদের বাড়ির চাকর—তার লেগেছে। একজন যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে তার লেগেছে, আরও দু'জনের লেগেছে। সব হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এস।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। বন্দুক উঁচিয়ে লরি-বোঝাই নিষ্ঠুর-দর্শন মানুষ আসছে। এককালে ওদের সাদা রঙ বিস্ময়ের উদ্রেক করত মানুষের, মনে হত কত সুন্দর ওরা। আজ মানুষের মনের আয়নার পিছনের পারা পাল্‌টে গিয়েছে। এখন সেখানে ওদের মুখের যে ছবি ফুটে ওঠে, তাতে নিষ্ঠুরতা মাখানো, ওদের নীল চোখের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখা যায় হৃদয়হীন হিংসা, ঘৃণা।

নেবু টেনে নিয়ে এল ভিড়ের পিছনে।—চল বাড়ি চল।

—দেখি একটু দাঁড়া।

আর গুলি চালানো দেখতে পেলে না শান্তি। ফিরল।

বাড়ির দরজা খোলা। ঘর শূন্য। গোপেন নেই। তার জামা নেই, জুতো নেই। কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।—কি হল গো? তুমি যে ছুটে গেলে! দেবা না ট্যাবা?

নেবু চিৎকার করে উঠল—ও কি কথা?

—লোকে যে বলছে মা। তোমার মা ছুটে গেল। তোমার মায়ের ছুটে যাওয়া দেখে তোমার বাবাকে ডেকে দিলে। বাবা তোমার ছুটে গেল।

শান্তি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নেবু বললে—বাবাকে দেখব মা?

কথা বলতে পারল না শান্তি; ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে—দেখ! দেখে আয়, যা।

নেবু ফিরে এল অনেকক্ষণ পরে।—না, বাবাকে পেলাম না।

দেবা-ট্যাবাও ফেরে নি।

জগো গালাগাল দিচ্ছে। কাঁদছে। জগোর ভাই এসেছে এই মরণ-তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে। জগোর ভাই কাজ করে যে বাড়িতে—সেই বাড়ির একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে গুলি লেগে মারা গিয়েছে। জগোই ও-বাড়িতে এককালে কাজ করত, নিজের ভাইকে জগো ও-বাড়িতে চাকরি করে দিয়ে নিজে এখন ঠিকের কাজ করে। ওই মেয়েটিকে সে দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। মেয়েটি বসেছিল তেতলার ঘরে—সেইখানেই গুলি-বিদ্ধ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত জনতার ইট-পাটকেলের মধ্যে লরি থামিয়ে নেমে মুখোমুখি গুলি চালাতে সাহস করে নি। চলন্ত লরি থেকে গুলি ছুঁড়েছে—সেই গুলি এসে লেগেছে মেয়েটিকে। চোদ্দ বছরের ফুলের মত মেয়ে।

জগো ছুটে বেরিয়ে গেল।

—মাসী, তুমি আর যেয়ো না বাছা এর মধ্যে। মাসী!

—মরব। আমিও মরব। ওরে আমার নিজের হাতে মানুষ করা রে।—বুক চাপড়াচ্ছে জগো।

জগোর ভাইও বলছে—আয়, আয়, একবার দেখবি না? আয়, মরণ তো একবার ছাড়া দু'বার হয় না। আয়! বন্দুকের গুলিকে আর ভয় নেই—আয়! বাচ্চা মল'—জোয়ান মল'—বুড়ো মল'—কুলি মল'—মজুর মল'—বাবু মল'—ভাই মল'—আয়—! চলে আয়! মরব—চলে আয়!

শান্তি সেই থেকে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

জগোর ভাই খবর নিয়ে এল। শান্তির তো ভাই নেই: না থাক্—দেবা-ট্যাবা দুই ভাই গিয়েছে, দেবা মরলে ট্যাবা খবর আনবে, ট্যাবা মরলে দেবা আসবে কাঁদতে কাঁদতে।

আসছে, আসছে—দু'জনের একজন আসছে। কিন্তু গোপেনের তো ভাই নেই! শান্তিও

জগোর মত বেরুবে নাকি?

চার

বুধবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী। দিন শেষ হয়ে এল। শান্তি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। গোপেন বেরিয়ে গিয়েছে—তার ফেরার কথা নয়, দেবা-ট্যাবাও ফেরে নি। সে ভাবছে দু'টোই কি মরেছে? না হলে তো একটা অন্তত ফিরত কাঁদতে কাঁদতে। পাড়ার ছেলেগুলোর অনেকে ফিরেছে। নেবু তাদের সন্ধান করে এসেছে। তারা বলেছে—সেই সকালবেলাতেই তাদের সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তারপর আর তারা ওদের খবর জানে না। হুঁশিয়ার মেয়ে নেবু, খুঁটিয়ে খবর এনেছে। গ্রে স্ট্রীটে একটা রেশনের দোকানের সামনে লোক জমায়েত হয়। দোকান ভেঙে লুঠ করে নেবার জন্য দরজা ভাঙবার চেষ্টা করে। পুলিশের লরি এসে পড়ে। গুলি চালায়। গোলমালের মধ্যে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। ওদের দলে ছিল এগার জন। পাঁচজন এক দিকে পালিয়েছিল—তারাই ফিরেছে। বাকী ছ'জনের মধ্যে দেবা ট্যাবা ছাড়া চারজনের নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবু তাদের খবরও করেছে। চারজনেব দু'জন ফিরেছে। তারা বলেছে—ওরা ছ'জনই একসঙ্গে ছিল। গ্রে স্ট্রীট থেকে গলি-গলি ওরা পালিয়ে যায়। হেঁদোর ধারে গিয়ে খবর পায়—মানিকতলা বাজারের ওখানে খুব কাণ্ড চলছে। সেখানে গিয়েছিল ওরা। সেইখান থেকে দেবাদের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

নেবু বললে—সেখানে নাকি বিস্তর লোক। হাঙ্গামার দরুণে। দু'তিন হাজার লোক রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি এসে দাঁড়ালেই বোঁ বোঁ করে ইট ছুঁড়ছে। পুলিশ ও মিলিটারী লরি এলেই সব যে যার গলিতে ঢুকে পড়ছে। লরিও চলতে আরম্ভ করছে, ব্যস, গলি থেকে বেরিয়ে আবার বোঁ-বোঁ করে ঢেলা।

শান্তির আর এ সব শুনবার ধৈর্য ছিল না—সে চিৎকার করে বলল—বোঁ-বোঁ করে ঢেলা, বোঁ-বোঁ করে ঢেলা! শুনতে আমি আর পারছি না নেবু। ওরা মরেছে—এই খবরটা এনে দিতে পারিস?

এই কথাটা শান্তির মুখেও নতুন নয়, নেবুর কানেও নতুন নয়। আজ তিন বৎসর ধরে, অর্থাৎ যত কাল মিলিটারী লরির চাকায় আর গোঙানিতে কলকাতা কাঁপছে—ততকাল মাসে অন্তত তিন-চার দিন এই কথাটা বলে আসছে শান্তি। নেবুকেই বলে আসছে। কিন্তু আজকার কথাটা যেভাবে বললে—সেভাবে আর কখনও বলে নি।

নেবুর সকল উৎসাহ নিভে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে—আর একবার দেখব মা?

—না। তোমার জন্যে আর আমি ভাবতে পারব না।

নেবুও কম নয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছে তাই রক্ষা, বেটাছেলে হলে এতদিন ও চুরি করত, গাঁট কাটত, আরও অনেক কিছু করত। বাজার থেকে নেবু লঙ্কা চুরি করে আনে, ফিরিওয়ালার ডালা থেকে জিনিস তুলে নেয়; সেদিন কন্‌ট্রোলের কাপড়ের দোকান থেকে একটুকরো ছিট সুকৌশলে পেটআঁচলে পুরে নিয়ে এসেছে। গোপেন যে কাবুলীওয়ালাটার কাছে টাকা ধার করে—সেই কাবুলীওয়ালাটার কাছে ও আঙুর, বেদানা, হিং আদায় করে। সুদ চাইতে এলে নেবু বাইরে যায়—তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের বলে—আজ নেহি। আজ নেহি! ভাগো আজ!

তারা নেবুর গাল টিপে আদর করে দিয়ে সত্যিই ভেগে যায়।

গলির মোড়ে একদল জোয়ান ছেলের আড্ডা বসে। শান্তি নিজের চোখে দেখেছে—ওদের সঙ্গে নেবুর হাসিখুশী। ঢেলা মেরে ছুটে নেবুকে পালিয়ে আসতে দেখেছে। সে লক্ষ্য করে দেখেছে—ওই ছেলের দলের নজর নেবুর উপর আর চানাওয়ালীর একটি মেয়ে

আছে—সেটার উপর। চানাওয়ালীর মেয়েটা নেবুর চেয়ে বয়সে বড়। সেটার বদনাম হতে আরম্ভ হয়েছে।

গোপেনের চাকরিতে দিন কাটে। সে এসব কথা জানে না। জানে শুধু কাবুলী-ওয়ালাদের সঙ্গে প্রীতির কথাটুকু। সেটুকু সে সহ্য করে নিয়েছে। সহ্য না করে উপায় নেই, তাই এ নিয়ে মেয়েকে সে কিছু বলে না, কিন্তু অন্য একটা ছুতো নিয়ে, সে মেয়েকে প্রহার করে। যেদিন কাবুলীওয়ালা এসে শুধু হাতে ফিরে যায়—সেদিন নেবুর অদৃষ্টে প্রহার নিশ্চিত।

কথাটা নেবু ঠিক ধরতে পারে নি এখনও, কিন্তু শান্তি বুঝতে পারে সবই। সে মুখ বুজে থাকে। নেবু লংকা আনে বিনামূল্যে সেজন্যও শান্তি কিছু বলে না ; মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন করে উঠলেও এটা প্রায় তার সহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু নেবুর দেহের দিকে তাকিয়ে, ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে তার রীতি-আচরণ দেখে শান্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে নেবুর সম্বন্ধে। নেবুকে সন্ধ্যার মুখে কোথাও যেতে দিতে তার ভরসা হয় না।

নেবু পাশে বসল। মায়ের মুখ দেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না তার। তবু সে মধ্যে মধ্যে সাহস করে দু-চারটে কৌতুকজনক সংবাদ না বলে পারলে না ; কৌতুকও বটে—আবার হয়তো মাকে একটু হাসাবার জন্যেও বটে। মায়ের মুখের এ গুমোট সে সহ্য করতে পারছিল না আর।

—যা-তা কাণ্ড। যাচ্ছেতাই। দুষি-নিদ্দুষি নেই গুলি ছুঁড়ছে—যার গায়ে লাগে লাগুক। ওই যে জগো কাঁদছে, গণেশ টকীর কাছে বাড়ি তাদের, মেয়েটা তেতলায় জানলাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—কেন দেখছিল? শান্তি চিৎকার করে উঠল—কেন দেখছিল?

নেবু স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে। বুঝতে পারলে না—অন্যায় সে কি বললে!

শান্তি আবার চিৎকার করে উঠল—আর এরা যে লরি পোড়াচ্ছে, ঢেলা মারছে, লুঠ করছে! যারা পোড়াচ্ছে তাদের ধরে এনে ধরে দিক ওদের বন্দুকের সামনে—ওরা নিদ্দুষিকে মারবে না গুলি।

উত্তেজিত হয়ে শান্তি উঠে দাঁড়াল।—তুই বোস। আমি দেখছি।

শান্তি চলে গেল।

নেবু বসে রইল চুপ করে। নেবুর মনে উদ্বেগ না-থাকা নয়, চারিদিকে গুলি চলছে, মানুষ মরছে, কত রকম খবর সে শুনেছে এরই মধ্যে—কত গুলী খেয়ে মরার কথা, কত ঢেলা মেরে পুলিশ মিলিটারির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কথা, কত লরি পোড়ানোর কথা ; চোখেও সে খানিকটা দেখেছে। শ্যামবাজারের মোড়ে গুলি চালানো সে দেখে নি কিন্তু গুলি খেয়ে যারা পড়েছিল তাদের সে দেখেছে। দেবা-ট্যাবার সন্ধানে বেরিয়ে ওদের সঙ্গীদের কাছেই শুনেছে কত কথা। ট্যাবার কথাই তারা বলেছে—বলেছে —"জান নেবুদি, ট্যাবা একটা গলির মোড় থেকে যা একখানা ঢেলা হাঁকড়ালে। বাঁ-ই করে গিয়ে লাগল লরিতে। আমরা দে ছুট! দুম-দুম করে গুলির শব্দ হল। যে যেদিকে পারি আমরা ছুটে পালালাম। খানিকটা পরে এসে দেখি ট্যাবা নেই।

দেবা কাঁদতে লাগল। আমরা আবার ফিরলাম, দেখলাম—ট্যাবা পড়ে গিয়েছিল সে উঠছে।

—আমরা ছুটে গেলাম। ট্যাবা হি-হি করে হাসতে লাগল। বললে, "পালাতে পারলুম না—পড়ে গেলাম। তো পড়েই থাকলাম—বুঝলি! ওরা ঠিক ভেবেছে গুলি লেগেছে।" ওরা আরও বলেছে : ওরা শুনেছে—"গুলি চালানোর সময় শুয়ে পড়লে আর ভাবনা নেই। বুঝলে নেবুদি—সটান মাটির সঙ্গে সেঁটে উপুড় হয়ে পড়ে থাক—নড়ো না—বাস—মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে গুলি—সাঁই-সাঁই—গায়ে লাগবে না। ওরা ভাববে মরে গেছে। যখন চলে যাবে তখন উঠে পড়। বুঝলে নেবুদি, ট্যাবাটা আস্ত বিচ্ছু, ও শুয়েছিল কিন্তু হাতের ঢেলাটি ছাড়ে নি। যেই না মোটরের চলে যাওয়ার শব্দ হয়েছে

—বোঁ করে উঠেই সেটা হাঁকড়ে, একদম সড়াক গলির মধ্যে।"

এসব কথাগুলোর মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ এবং উত্তেজনার আভাসই নেবু পেয়েছে, ভয় পায় নি। তাই দেবা-ট্যাবার জন্য তার যে উদ্বেগ—সে উদ্বেগ খুব বেশী নয়। মায়ের মত নয়।

নেবু দাওয়ার উপরে বসে পা দোলাতে আরম্ভ করলে। ভয় কিসের এত? দেবা-ট্যাবা মরবে না সে জানে। মরবে কেন? তা ছাড়া গুলি যদি লাগেও, তাই বা কি? গুলি লাগলেই কি মরে? ওদের গুলি আছে—এদেরও ঢেলা আছে। বাঁ হাতে যা ঢেলা ছোঁড়ে ট্যাবা, লাগলে আর রক্ষে নেই! মাথায় লাগলে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। ঠিক ফিরে আসবে—দেবা-ট্যাবা।

ছোট ভাই দুটো খেলা করছে পথের উপর। হাবাটা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ছোটটা পথের ধুলোর উপরে বসেছে—একটা কচি আমড়া আর একটা দেশলাইয়ের খোল-ভর্তি ছোলাভাজা নিয়ে। নেবুর বন্ধু ওই চানাওয়ালীর মেয়ে লছমিয়া দিয়েছে নিশ্চয়। বড্ড নোংরা এই ছোট ভাই সাবুটা। পথের ধুলোর উপর ছোলাগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে এক-একটা করে। ঠিক ওইখানটাতেই—উঃ, গা বমি-বমি করে উঠল নেবুর। ওই বড় বাড়িতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে—সেটাকে নিয়ে ও-বাড়ির ছেলেরা রোজ বিকেলে এইখানে খেলা দেয়। বল ছুঁড়ে দেয়, কুকুরটা ছুটে গিয়ে সেটাকে মুখে করে তুলে আনে। দু'দিন আগে কুকুরটা ঠিক ওইখানটাতেই পায়খানা করেছিল—হঠাৎ হেসে ফেললে নেবু—ঠিক তার মিনিট কয়েক পরেই একজন হন-হন করে জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেল পায়খানাটা মাড়িয়ে। খানিকটা চলে গেল বাবুটার জুতোর সঙ্গে, খানিকটা চেপটে বসে গেল ওইখানটায়। খা—খা, তাই খা মুখপোড়া—শয়তান—ওই ময়লাই খা। শয়তানটাকে সরিয়ে আনবার উপায় নেই। ওকে যদি এ সময়ে কেউ ছোঁবে তো একেবারে চিলের মত চিৎকার করে শুয়ে পড়বে মাটিতে।

—আরে! পথের ধুলোতে ছোলাগুলো ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে। এই নেবু—তোল না এটাকে!

নেবুদের প্রতিবেশী কানু। এ পাড়ার এ অঞ্চলের বিখ্যাত কানু। বেশ সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে কানু।

নেবু কানুর কথার কোন জবাব না দিয়ে নির্বিকার ভাবে উল্টে প্রশ্ন করলে—কি, সেজেগুজে বাবুর যাওয়া হচ্ছে কোথায়? উঃ! সাজ হয়েছে দেখি বাহারের! সাহেব সেজেছেন বাবু!

হাফ-শার্ট, হাফ-প্যান্ট, পায়ে গোড়ালিতে স্ট্র্যাপ বাঁধা 'স্বামী-স্ত্রী স্যান্ডেল' (অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য) পরেছে কানু।

—মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস নে। দেব এক ডান্ডা বসিয়ে মাথায়। হাতের ডান্ডাটা দেখালে কানু। লোহার ডান্ডা একটা।

অত্যন্ত চতুর মেয়ে নেবু। সে বুঝতে পেরেছে কানুর এই বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য। সে ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ। অ কানুদার মা—। দেবু বলে?

এর পর অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললে—চললে বুঝি লরি পোড়াতে? ঢেলা মারতে?

কানু গম্ভীর মৃদু স্বরে বললে—চেঁচাস নি। মা শুনতে পাবে।

—আমাকে সঙ্গে নেবে? আমি যাব?

—তুই যাবি?

—চল না সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের চেয়ে আমি ভাল পারব।

কানুর তাতে সন্দেহ নেই। নেবুর উপর বিশ্বাস তার অনেক ছেলের উপরে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশী। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল সে নেবুর উপর।

কানু মোটের উপর অসৎ নয়, তবে তার সততার সংজ্ঞার মধ্যে নেবুর সঙ্গে রহস্যালাপ করা গন্ডীর বাইরে নয়, ঢেলা ছোঁড়াছুঁড়িও নয়; আজ সে তার গাল দু'টি টিপে দিয়ে

বললে -আয়। চলে আয় তা হলে।

—দাঁড়াও, কাপড়ের বদলে হাফ-প্যাণ্টটা পরে নিই।

—আমি আসছি দাঁড়া। কানু হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরল। ফিরে এল তার কাবলী জোড়াটা হাতে নিয়ে। নেবুদের দাওয়াটার উপর বসেই সে নিজে পরলে কাবলী জোড়াটা, নেবুর জন্যে রাখলে ওই স্বামী-স্ত্রী স্যাণ্ডেলটা। নেবুর পায়ে ঠিক হবে।

হিল্‌হিলে লম্বা নেবু সম্ভবত কানুর চেয়ে মাথায় আঙুল খানেক বড়। হাত-পাও বড় বড়। কানু মাথায় কিছু খাটো।

নেবু বেরিয়ে এল—হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরে, মাথায় একখানা কাপড়ের পাগড়ি এঁটে ; হাতের কাঁচের চুড়িগুলো পর্যন্ত খুলে রেখে এসেছে।

অবাক হয়ে গেল কানু।—ভারী চমৎকার মানিয়েছে রে তোকে!

—মানাবে না? নেবুর মুখখানা আশ্চর্য রকমের সুন্দর হয়ে উঠল এই মুহূর্তটিতে।

কানু তার হাত ধরে বললে—বোস।

নেবু বসতেই কানু তার পা টেনে নিয়ে জুতো পরাতে বসল। খিল-খিল করে হেসে উঠল নেবু।

ভাই দুটো পথে খেলা করছে। নেবু একবার ভেবে নিলে। তারপর দুটোকে দু'হাতে ধরে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দিলে। কাগজের ঠোঙায় মুড়ি ছিল—মুড়ির ঠোঙাটা মেজের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—খা।

কানু বললে—আহা মাটিতে ঢেলে দিলি কেন? একটা কিছুতে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নেবু বললে—থামুন মশায়, আপনি কিছু জানেন না। হাসতে লাগল সে। আরও একটা কি যেন খুঁজছে নেবু।

কানু বললে—মিইয়ে যাবে, ধুলো লাগবে।

—হ্যাঁ! কিছুতে করে দিলে—রাক্ষসেরা এখুনি সব খেয়ে ফেলবে। মাটিতে ঢেলে দিলাম, তুলতে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে—কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবে।

দেশলাইয়ের বাক্সটা খুঁজে বার করে উঁচু তাকের উপর তুলে দিলে।

—আয়, আর দেরি করিস নে।

—যাচ্ছি। বঁটিটা তুলে দিই। ওই ছোটটাকে বিশ্বাস নেই, ওটা সব পারে। রাগ হলে মেরে দেবে কোপ। ওটা বড় হলে খুব লড়াই করতে পারবে। তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

ঘরের আলোটা জেবলে দিয়ে নেবু বেরিয়ে এসে ঘরে শেকল দিতে দিতে বললে—থাক্—কাঁদিস নে। আসছি আমি। চল।

লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ল রাস্তায়।

—গলির মধ্যে দিয়ে চল কিন্তু।

লজ্জা হচ্ছে নেবুর। কানুর সঙ্গে এই বেশে তার লজ্জা করছে। আয়নাতে সে দেখে নিয়েছে মাথায় পাগড়ি পরে তাকে অবিকল শিখের বাচ্চাদের মত দেখাচ্ছে : বাসে সে শিখদের ছেলে দেখেছে। খুব ভাল করে দেখেছে। সেই দেখার ফলেই সে নিজের খোঁপাটা খুলে চুলগুলো পিছন দিক থেকে টেনে এনে সামনের দিকে চূড়োর মত বেঁধে তবে তার ওপর পাগড়ীটা বেঁধেছে। হাতের চুড়িগুলো খুলে রাখতেও ভুল হয় নি তার। কেউ চিনতে পারবে না—নিজেই নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হয়েছে, তবু লজ্জা করছে নেবুর।

—আয়। নেবুর হাতখানা ধরলে কানু।

—ছাড়, হাত ছাড়। হাত ছাড়িয়ে নিলে নেবু।

সংকীর্ণ গলিটা থেকে সংকীর্ণতর একটা গলি বেরিয়েছে। দু'ধারে বস্তী। তার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ। ডাইনে—বাঁয়ে—আবার বাঁয়ে—এবার সিধে, আবার বাঁয়ে। এবার সোজা দেখা যাচ্ছে রাস্তা। আলো জ্বলছে। আবার লজ্জাবোধ করছে নেবু।

--ধ্যেৎ--আমি যাব না।

কানু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই তার দলবল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে বলল—যাবি না তো আমায় দেরি করিয়ে দিলি কেন? ভাগ্। হাজার হলেও মেয়েছেলে তো! এদিকে সিনেমার নামে—তখন ঠিক আছে। ভাগ্—ভাগ্—ভাগ্।

কানু হন-হন করে এগিয়ে গেল।

এবার পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নেবু এগিয়ে গেল—বললে—আয় না, আয় না রে! আয় না!

খিলখিল করে সে হাসতে লাগল।

* * *

নেশা লেগেছে নেবুর মনে। সে জন্মেছিল একখানা একতলা পাকা-ঘরে, তিন বছর বয়সে এসেছিল একটা টিনে-ছাওয়া কোঠায়, পাঁচ বছর বয়স থেকে এই চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সে বস্তীর খোলার ঘরে জীবনের আলো-বাতাস হাব-ভাব ধারা-ধরন আয়ত্ত করেছে। তাদের বস্তীটা ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। এই বস্তীর গায়ে চাকর ও ঝিয়েদের বস্তী। মজুরদের বস্তী। তারপর হল দেহ-ব্যবসায়িনীদের বস্তী। সেই বস্তীর মেয়ে নেবু। ওই তিনটে পল্লীর বাতাসের সঙ্গে ওদের ছোঁয়াচ অল্প-স্বল্প আছে ওর মধ্যে। আরও একটা পল্লীর ছোঁয়াচও আছে। ওই পল্লী দু'টোর বাতাসে নিশ্বাস নিতে নেবু অস্বস্তি বোধ করে—যেন ভ্যাপ্সা অসুস্থ গন্ধ অনুভব করে—কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হয়। অন্য পল্লীটার বাতাসে সে ইচ্ছা করে নিশ্বাস নিয়ে আসে। তাদের বস্তীর দক্ষিণ দিকে বাগবাজার স্ট্রীটের কাছাকাছি পাকা দালানের বসতি। ছেলেরা কলেজে যায়, মেয়েরা ঢাকাই শাড়ি—হিল-তোলা জুতো পরে কপালে সিঁদুরের টোপা দিয়ে সিনেমায় যায়; জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে সোফা কৌচ—চেয়ার টেবিল। বাতাসে সেণ্ট-সাবান-গন্ধতেলের সুবাস। করপোরেশনের সমালোচনা, ইলেকশ্যনের মিটিং, ও-পাড়ার ছেলেদের ব্যায়াম-সমিতির আখড়ায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, সার্বজনীন পুজো, মিটিং।

পিছনে ঝিয়েদের বস্তীতে—চাকর এবং ঝিয়ের ভালবাসা, ঝগড়া, মারামারি। সামনে কলেজে-পড়া ছেলে—ইস্কুলে-পড়া মেয়ে—চিঠি দেয় এ—ওকে। ওই তো বড় বাড়িটার মেয়েটা কলেজে যায়—মোড়ে ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে ওর একজন ছেলে-বন্ধু। একতলা দালান। বাড়িটার দুই মেয়ের বড়জন চাকরি করে; স্ট্র্যাপ-দেওয়া ব্যাগটার স্ট্র্যাপ বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে চোখে গগল্স্ পরে মশলা খেতে খেতে চাকরি করতে যায়, ফিরবার সময় রোজ ওর একজন পেণ্টালুন আর শার্ট পরা বন্ধু তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়; ছোট বোনটা যায় ডাক্তারী পড়তে, স্টেথিসকোপ হাতে বই বগলে আসে যায়। ওরও বন্ধু আসে সঙ্গে। বড় রাস্তায় দাঁড়ালে হরদম চোখে পড়বে ছেলে আর মেয়ে—মেয়ে আর ছেলে—হাসতে-হাসতে চলেছে, কথা বলতে বলতে চলেছে। তাদের বস্তীতেও এই হাল-চাল ঢুকেছে। ওই যে তাদের বস্তীর শেষ বাড়িটার মোটাসোটা কালো মেয়েটি—সেও রোজ বার হয়, ওদের বাড়ির দু'খানা এদিকের বাড়ির কালো কাঠির মত মেয়ে অনিলা—সেও যায়, জুতো পায়ে দিয়ে—ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে। ওরা যায় একটা সেলাই শেখার সমিতিতে। ওদেরও বন্ধু আছে। পথের মোড়ে আগে তারা দাঁড়িয়ে থাকত। এখন তো মোটা মেয়েটি—কি নাম ওর?—বিজলী—হ্যাঁ, বিজলীই ওর নাম,—বিজলীর বন্ধু তো এখন বাড়ি পর্যন্ত আসে। সেদিন নেবু ওদের দুজনকে বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর যেতে দেখেছে। অনিলার বন্ধু এখন এই গলিটার মোড় পর্যন্ত আসে। তার মা-বাপের মধ্যে আলোচনা শুনেছে সে—এইভাবেই এখন বিয়ে হচ্ছে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের। বিশেষ করে যেসব মেয়ের বাপের পয়সা নেই—তাদের বিয়ের এই ছাড়া

আর উপায় নেই। আরও আছে। এই তো সেবার—আগস্ট আন্দোলনে—এ পাড়ার বড়লোক, বড়লোকের ছেলে থেকে দোকানদার ওই যে মাখনের দোকান করে—সে পর্যন্ত জেলে গিয়েছিল, কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদি এরাও জেলে গিয়েছিল। ওই যে বুড়ো ডাক্তারবাবুর মেয়ে ইলা, সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশে ধরবার আগেই। ওরই একজন বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই। সেইখানে তারা হাঙ্গামার মধ্যে ধরা পড়েছিল। এখন দু'জনে ছাড়া পেয়েছে, বোম্বাইয়েই আছে—দু'জনে বিয়ে করেছে—এইসব কাজই করে। যাও না সিনেমায়—সেখানে দেখবে—ছেলে আর মেয়ে হাত-ধরাধরি করে চলা তো চলা—নাচছে! জানলার ধারে ঘরের মধ্যে মেয়ে—বাইরে রাস্তায় ছেলে দাঁড়িয়ে গান গাইছে—'চিঠি দিয়ো'। 'ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন।' নেবুও গান গায়—ওই কানুর দলের সামনে দিয়ে আসবার সময় গুন-গুন করে গেয়ে চলে আসে।

আজ কলকাতার অবস্থা—শেকলে বাঁধা প্রহারজর্জরিত উন্মাদ পাগলের শেকল ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে ওঠার মত অবস্থা। দাঁতে দাঁত টিপে, বিস্ফারিত ঠোঁটের বিকৃত মুখে, দেহের সকল পেশী সকল স্নায়ু টান করে, সর্ব-শক্তি প্রয়োগে সে শিকল ছিঁড়তে চাইছে। মাথার বিশৃঙ্খল ধুলো-মাখা ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, রাঙা টকটকে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চক্ষুকোটর হতে। তারই নেশা লেগেছে নেবুর মনে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরের প্রান্তসীমায় পা দিয়েছে। পৃথিবীর সকল আওতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনের খুশিতে চলবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে পাখা-গজানো পাখীর ছানার মত। কানু বা কানুর দলের কোন একজনকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে সে অন্য সকলের মত চলতে চায়। কিছুদিন থেকেই এ সাধ উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার মনে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগস্ট আন্দোলন সে দেখেছে, সে জানে আগস্ট আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' জানে সে—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' তাও জানে সে ; যুগান্তরের দরজায় তার ছবি সে দেখেছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে জানে—মৌলানা আজাদ—পণ্ডিতজীকে জানে। আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জানে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নাম জানে। 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা' গানটা সে মুখস্থ করে ফেলেছে—সুর শিখেছে। বিশ্ব-যুদ্ধের আতঙ্ক—কষ্ট—দুর্ভোগ সে ভোগ করেছে। সাইরেন—কণ্ট্রোল—ব্ল্যাক আউট—লরির তলায় মানুষের অপঘাত—পথের উপর না খেয়ে মানুষের মৃত্যু—সমস্ত কিছুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার মনের ধাতুকে দু'পিঠে হাতুড়ির মত ঘা মেরে মেরে এমন বেদনার্ত স্পর্শাতুর করে রেখেছে যে, এতটুকু উত্তেজনার ছোঁয়ায়—চরমতম অধীরতায় চঞ্চল করে তোলে ; মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগে সে আজ যা করলে, ঠিক তাই ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এ নেশা লাগা অনিবার্য নেবুর পক্ষে।

শীতের শেষ—বসন্তের প্রারম্ভ—ঝোড়ো হাওয়া ওঠে—পাকা পাতা ঝরে স্বাভাবিক নিয়মে। ঝোড়ো হাওয়ার বদলে এসেছে অকালের ঝড়। পাতা ঝরে উড়ে নেচে-নেচে চলেছে আকাশে।

আঃ—কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদিদের সঙ্গে একবার দেখা হয় না! নেবু চলেছে আগে আগে। ছেলের দল তার পিছনে। তাদের বুকে রক্ত দোলা দিচ্ছে—প্রবলতর আন্দোলনে আজকের নেশাকে দ্বিগুণিত করে তুলেছে নেবু।

* * *

বোসপাড়ার ভেতর দিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু। অন্ধকারে গলির মুখে মানুষের জটলা শুধু। আর কিছু নেই। একটা পানের দোকানের সামনে জটলাটা বেশী। ঝুঁকে

গিয়ে পড়ল নেবু। জটলার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে একজন কটাসে রংয়ের লোক আস্ফালন করছে।

—ঢেলার সঙ্গে গুলির লড়াই! ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ! মাটির উপর থুথু ফেললে সে। এরপর হঠাৎ চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল ; বেড়ালের চোখের মত কটা চোখ, সে চোখ জ্বলে উঠলে অদ্ভুত একটা ছটা বেরিয়ে আসে,—অত্যন্ত ভয় লাগে দেখে ; শুধু তাই নয়,—ছোঁয়াচ লাগে সকল মানুষের চোখে। সে বলে উঠল—"মরদের বাচ্চা হও, সাহস থাকে তো দাও বাবা আমাদের হাতে রাইফেল-রিভলবার, তারপর হোক সামনা-সামনি লড়াই। ধর্মযুদ্ধ হোক।"

হঠাৎ সে হা-হা করে হেসে উঠল, বললে—"খালি হাতে যারা লড়াই করছে, তাদের হারাবার জন্যে ট্যাঙ্ক এনেছে—শ্যামবাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড একটা ট্যাঙ্ক।" হা-হা করে সে হাসতেই লাগল।

—কি নাম মশাই আপনার? জটলার পিছন দিক্ থেকে একজন প্রশ্ন করলে গম্ভীর ভাবে।

—নাম? ঘুরে তাকালে সে।

জটলাটা থম-থম করতে লাগল। হাসি বন্ধ হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল চকিত আতঙ্ক—তারপর ঘৃণা—তার পর ঔদ্ধত্য।

প্রশ্নকারী বললে—হ্যাঁ, নামটা বলুন না আপনার?

এগিয়ে গেল বক্তা। জটলার মধ্য থেকে কয়েকজন সরে গেল। কয়েকজন চোখে চোখে ইশারা করে লোকটার পিছনের দিকে যাবার আয়োজন করছে।

—নিন নাম।

—বলুন। বলে লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল।

কটা লোকটাও হা-হা করে হেসে উঠল।—ওরে শালা!

রসিকতা। লোকটা গোয়েন্দাগিরির অভিনয় করছিল রসিকতার কৌতুকে।

—কি খবর?

লোকটি বললে—খবর জগুবাজারে, হাজরায়, মানিকতলায়, রাজাবাজারে। খবর কাঁকিনাড়ায়, গুলি চলছে, স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেন পুড়িয়ে দিয়েছে। বিলকুল ট্রেন বন্ধ। লাইনের উপর লোক শুয়ে আছে—গাছ কেটে ফেলেছে। হা-হা। হাসতে লাগল সে।

সতর্ক হয়ে উঠল নেবু। তার সামনের লোকটা ফিরে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে নেবু তার বিস্ময়ের কারণ। ভিড়ের চাপে বুকের স্পর্শ লেগেছে লোকটার পিঠে। মুহূর্তে নেবু ভিড় থেকে গুঁড়ি মেরে, মাথা দিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কানুর জামাটা ধরে টান দিলে।

সামনে বাঁকের মাথায় একটা পার্ক, এ পাশে পেট্রোল পাম্প ; পার্কের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার—সেই অন্ধকারে আশ্রয় নিলে নেবু।

পার্ক পেরিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু পার হয়ে গলিপথ। ঢুকে পড়ল গলিটায়।

মানিকতলা জানে নেবু। বায়স্কোপ আছে একটা। সেখানে ছবি দেখে এসেছে।

দলটা এর মধ্যে ভেঙে গিয়েছে। তিনজন কোথায় খসে পড়েছে। পড়ুক। কানু সঙ্গে আছে।

মানিকতলার মোড়ে এসে নেবু-কানুর দল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জনতা জমে আছে। রাস্তায় ব্যারিকেড। তাদের বয়সী ছেলে অনেক। তারাই যেন সংখ্যায় বেশী। লুঙ্গি পাজামা পাজামা লুঙ্গি।

নেবু বললে—সব মুসলমান!

—হ্যাঁ।

একজন ঘুরে তাকালে নেবুর দিকে। বললে—কালকে হিন্দু-মুসলমান এক হো গিয়া পাঁইজী। লালবাজারমে এক হো গিয়া। হিন্দু-মুসলিম জিন্দাবাদ!

জোরালো শিসে সিটি বেজে উঠল উত্তর দিক থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। গলির মুখে ভাঙাচোরা লোহার আড়তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে গেল সব। যে লোকটি নেবুর সঙ্গে কথা বলছিল—সে বললে—আ যাও পাঁইজী। আতা হ্যায় উ লোক।

জোরালো আলো তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে। লরি আসছে। নেবু ব্যস্ত হল ঢেলা সংগ্রহের জন্য।

—চলা আও। চলা আও। আ গয়া—আ গয়া।

একটা গলির মুখ। রাস্তার গ্যাস-লাইটটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার থমথমে হয়ে উঠেছে সংকীর্ণতার আশ্রয়ে।

—বইঠ যাও—বইঠ যাও। আরে বসে পড় না।

লরি এসে থামল। থামল ঠিক নেবু-কানুরা যে গলিটায় আশ্রয় নিয়েছিল—তারই সামনে। ঢেলা হাতে নেবু উঠে দাঁড়াচ্ছিল, একজন হাত চেপে ধরলে।—হুঁ। ওদিকে লরিটার পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেলা এসে পড়েছে। আ—। দু'জন মাথায় হাত দিয়েছে। পিছন দিকে ফিরল ওরা—বন্দুকের মুখ ঘুরল। জনদুয়েক লাফিয়ে পড়ে ব্যারিকেড সরাতে লাগল। পিছনের দিকে টর্চ ফেলে খুঁজছে, ঝাঁটার মত ক্রম-প্রসারিত আলোর সীমানার বাইরে—আলো-আঁধারের মধ্যে ছায়া-মূর্তির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে সব—বাচ্চার দলই বেশী। বন্দুক উদ্যত করেছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিক থেকে এল ঢেলার ঝাঁক।

বন্দুকের শব্দ হল।

—লাগাও—আব লাগাও।

উঠে পড়ল নেবু। ছুঁড়লে ঢেলা। একটা দু'টো তিনটে।

ওদিকে ব্যারিকেড সরে গেছে। একটা লোক ঢেলা খেয়ে জখম হয়েছে। তাকে টেনে তুলে নিলে লরির উপর। লরী পূর্ণ বেগে ছুটল। পিছন থেকে ছুটে বার হল মানুষের দল—বুনো কুকুরের দলের মত। বাঘের সঙ্গে লড়াই দেয় বুনো কুকুরের দল। তাকে চার পাশ থেকে আক্রমণ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে। চিৎকার করে আক্রোশে, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ায় কামড়ায়, আক্রান্ত ক্রুদ্ধ শক্তিমত্ত বাঘ গর্জন করে—মধ্যে মধ্যে হাঁকড়ায় তার থাবা,—ডাইনে বাঁয়ে—যেটাতে লাগে সে থাবা—সেটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কখন বিদ্যুৎগতিতে পিছন ফিরে অগ্রগামীটার উপর লাফিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে দেয় ; কিন্তু তবু সে থামতে পারে না—ছুটতে হয় তাকে ; সমষ্টির শক্তির পরিচয় সে জানে—সে ছুটে চলে।

পাগল বুনো কুকুরের দল আহতদের পিছনে ফেলে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর।

এও প্রায় তাই। উন্মত্ত ক্ষোভে মানুষ হয়ে উঠেছে যেন কুকুরের দল। তাদের বনে এসেছে বাঘ ; আহারের অভাব ঘটে গেছে তাদের, ভয়ে সঙ্কোচে অন্ধকারে আত্মগোপন করে করে অধীর হয়ে উঠেছে তারা, তার উপর প্রকৃতি হয়েছে নির্মম—শীতার্ত বনভূমি ; সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তাদের—তারা বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর বসতি যে থাবায়—দাঁতে—সেই থাবার পাশে পাশে ছুটছে।

গুলি ছুটে এল এক ঝাঁক, ধাবমান লরি থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকেরা। লরি দূরে চলে গেছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে লাল দু'টো আলো।

এবার রাস্তার উপর ছোট-ছোট জনতা। এখানে ওখানে সেখানে। আহত হয়েছে যারা—যারা পড়েছে তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়েছে সব।

আরও একখানা লরী আসছে পিছনে। এ্যাম্বুল্যান্স আসছে—ডাক্তারদের গাড়ি—মিটিয়া কলেজে নিয়ে যাবে। তার আগেই ওরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বস্তীর মধ্যে। মিটিয়া কলেজ সম্বন্ধে ওদের অনেক আতঙ্ক, সেখানে ছুরি চালায়, মরা লাশ ফালি ফালি করে চিরে ফেলে। তারপর তদন্ত। সে তদন্তে এই বস্তীতে ওর বাড়ি জানাজানির সঙ্গে

সঙ্গে বস্তী ঘিরে ফেলে লাল-পাগড়ি। খানাতল্লাশ।

—উঠাও। উঠাও জলদি।

কানু কই! কানু! কানু! বিমল! হেমন্ত! নরেন কই?

রাস্তার আলো কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, কুয়াশাটা কালো হয়ে আসছে। নেবু টলছে। সুখের তারা হীন দুঃখের মেঘে ভরা আকাশের মত নেবুর মন—কালো কুয়াশায় হারিয়ে গেল কলকাতার আলো, হাঙ্গামায় জমায়েত এত মানুষ—সব ঢেকে মিলিয়ে গেল। কিছুই মনে হচ্ছে না, কাউকে মনে পড়ছে না; শুধু একটা তীব্র যন্ত্রণা। তাও মিলিয়ে যাচ্ছে। নেবু পড়ে গেল রাস্তার উপর।

* * *

—নেবু! নেবু! নেবু! ওরে নেবু!

—নেবু খা লিয়া। কমলা নেবু! হা-হা করে হেসে উঠল কতকগুলি লোক। আহতদের রেখে আবার তারা ফিরে এসেছে। অবশ্য এখন তারা সংখ্যায় অনেক কম। কানু নেবুকে খুঁজছে! বিমল—হেমন্ত—নরেন এরা সব কে কোথায় গেল? সব ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য কানু ভাবছে না। সে খুঁজছে নেবুকে। গলির মোড়ে মোড়ে জনতার মধ্যে সে খুঁজছিল মাথায় পাগড়ি। গলির মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

—এ ভাই, একজন মাথায় পাগড়ি—শিখের ছেলে দেখেছ?

—হ্যাঁ। একজন তো দেখেছিলাম। সে তো গুলির আগে। পরে তো দেখি নি।

—নেবু!

কোথায় নেবু? বস্তীর মধ্যে আহতদের কাতরানি, চাপা কান্না, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত কণ্ঠের চাপা শাসন। ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল কানু। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

—নেবু!

দূরে একটা জনতা জমেছে। রেডিয়োতে খবর বলছে। কথাগুলো কানে অস্পষ্ট ভাবে বাজছে। ওখানে নেই তো! এগিয়ে গেল কানু।

"বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলকাতার অধিবাসীদের সাবধান করে এক ইস্তাহার জারী করেছেন। তার মর্ম হচ্ছে এই যে, যে কেউ রাস্তা অবরোধ করবে বা রাস্তার চলাচল বা ব্যবহারে বাধা জন্মাবে, পুলিস বা সামরিক বাহিনী তাদের গুলি করতে পারবে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত জনসভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছেন।"

এই ইস্তাহারে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেক শান্তিকামী নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং বিনা বাধায় স্বাধীন ভাবে যাতে তাঁরা আইনসম্মত কাজকর্ম করতে পারেন—তার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য—সে কর্তব্য তাঁরা অবশ্যই পালন করবেন।"

—আতা হ্যায়! আতা হ্যায়!

আবার মোটরের আলো এসে পড়েছে—আসছে। ব্যারিকেড ঠিক করো।

গাড়িটার উপরে জোর আলো জ্বলছে। মাথার উপরে পাশাপাশি বাঁধা দু'টো ঝাণ্ডা। তেরঙ্গা আর সবুজ। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল।

"নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধ, কংগ্রেস এবং লীগ—দুই প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ—এই ধরনের উন্মত্ততায় আপনারা অকারণ শক্তিক্ষয় করবেন না। বৃহত্তর সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে—।"

কানু আর দাঁড়াল না।—নেবু! কোথায় গেল নেবু? নেবু! নেবু!

হঠাৎ মনে হল এ্যাম্বুল্যান্সখানা এখান থেকে উত্তর মুখে ফিরে গিয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ!

শেষ রাত্রির কলকাতা। তিনটে বাজছে। কানুর ক্লান্ত পায়ের কাবলীর আওয়াজ উঠছে পিচের রাস্তার উপর। শীতের রাত্রেও ঘেমে উঠেছে কানু; বুকের ভিতর অসহনীয় উদ্বেগ—চোখ জ্বলছে—কেঁদেছে সে—প্রচুর কেঁদেছে নেবুর জন্য। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—ক্যাম্পবেল—সমস্ত জায়গা ঘুরেছে সে। সঠিক খবর পায় নি—আহতদের দেখতে পায় নি রাত্রে—কিন্তু তার মধ্যে কিশোরী কুমারী কেউ নেই। মৃতদের দেখেছে সে। দেখে ভয় হয় নি তার। কিন্তু উদ্বেগ আক্ষেপ বেড়েছে। নেবু কোথায় গেল তবে?

মহানগরীর রাজপথের শেষ রাত্রের জনহীন রূপ—সে রূপ ভয়ংকর। যে প্রাণ-সমুদ্র এই বিরাট ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন কঠিন রূপকে ঢেকে রাখে—সে প্রাণ-সমুদ্র রাত্রের অন্ধকারে সুপ্তির মধ্যে অদৃশ্য। জড় রাজত্ব আপনাকে প্রকট করে তুলেছে এখন। মরা পাহাড়ের বুকে একক যাত্রীর মত চলতে চলতে কানু কেঁদেছে। অজস্র কেঁদেছে।

—নেবু! নেবু!

থমকে দাঁড়াল কানু।

নেবুদের বাড়ির দাওয়ায় বসে শান্তি আর গোপেন।

—কে?

—আমি!

—কে? আমিটা কে?

—আমি কানু।

—কানু? নেবু—

—এ্যাও—! হঠাৎ গর্জন করে উঠল গোপেন। শান্তি স্তব্ধ হয়ে গেল।

কানু এবার সাহস করে ঢুকল গলির মধ্যে। একবার থমকে দাঁড়াল—ঘরে আলো জ্বলছে। দেবা—ট্যাবা—হাবা—সাবু—চারজনে শুয়ে রয়েছে। নেবু নেই। এতক্ষণে চোখে পড়ল—গোপেনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু প্রশ্ন করবার মত কণ্ঠস্বর বার হচ্ছে না। কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। নেবু! নেবু!

উঃ! ঝাঁকি দিয়ে মাথাটায় নাড়া দিয়ে—কানু দ্রুত চলে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে। দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। ডাকবার মত কণ্ঠস্বরও তার নেই। নেবুর জন্য কান্নায় তার সকল স্বর ভরে আছে। সে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে, দরজার গোড়াতেই একটুকরো বাঁধানো রোয়াক,—তারই উপর শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

নেবুর মা শান্তি নেবুকে গর্ভে ধরার জন্য প্রথমটা কপালে চড় মেরেছে। চড়ের পর চড়। শুধু একা নেবুকে গর্ভে ধরার জন্যই নয়—সকল সন্তানগুলোকে গর্ভে ধরার জন্য প্রচণ্ডতম আক্ষেপে কপালে করাঘাত করেছে, নিজের গর্ভের উপর আঘাত করেছে, সবগুলোর মৃত্যু কামনা করেছে, স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কয়েকবার গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গঙ্গার তীরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এক মুহূর্তে। কিন্তু ফিরেছে। নেবু দেবু টেবু আর তার স্বামীর সংবাদ না পেয়ে মরতে যেতে পারে নি। মরে শান্তি পাবে না সে।

একটা দুটো তিনটে চারটে লাশ একে একে আসুক—সবগুলোর মুখে আগুন দিয়ে—তারপর। সকলের আগে আসুক নেবুটার লাশ। সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাক। তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে—দেহে 'মেয়ে-লক্ষণ' ফুটতে আরম্ভ করেছে—সে এই দুর্যোগের কলকাতার—এই মন্বন্তরের কলকাতার—এই রাক্ষুসে কলকাতার পথে বেরিয়েছে সন্ধ্যের পর রাত্রিকালে! গহন অরণ্যে আর রাত্রের কলকাতায় কোন তফাৎ

নেই। তাদের পিছনে ওই ঝিয়েদের বস্তী, তারও পিছনে বেশ্যাদের বস্তীর সরু গলিপথে যে সব মানুষ চলে-ফেরে—তাদের চোখের চাউনি আর জানোয়ারের চোখের চাউনির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বড় রাস্তায় পুলিশ বেরিয়েছে—পল্টন বেরিয়েছে—লাল-মুখো গোরার দল—আফ্রিকার দলবদ্ধ সিংহের মত ঘুরছে। হারামজাদী নেবুই একখানা বই এনেছিল ও-বাড়ির কানুর কাছ থেকে—'বনে জঙ্গলে' নাম বইখানার, তাতেই শান্তি পড়েছে—সিংহ বের হয় দল বেঁধে। সে নিজে দেখতে গিয়েছিল দেবা আর ট্যাবাকে অনেক দূর পর্যন্ত। বাগবাজারের মোড় থেকে নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল এ্যাভিনুর খানিকটা দূর অবধি সে গিয়েছিল। কোথায় দেবা—কোথায় ট্যাবা? তবে অন্য লোকের অনেক দেবা-ট্যাবাকে দেখে এসেছে। ক্ষুদে শয়তানের দলের কোন দিকে দৃকপাত নেই, মরণ-বাঁচন জ্ঞানগম্যি নেই, কারও কথায় কর্ণপাত করে না—এই নিয়েই মত্ত। জয়হিন্দ্! নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী জয়! বন্দে মাতরম্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! বার দুই-তিন শান্তি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—দুটি ছেলেকে জান? নাম দেবা আর ট্যাবা! বাগবাজার বাড়ি। ছোট ছেলেটা ট্যাবা, বাঁ হাতে ঢেলা ছোঁড়ে!

কথার উত্তর না দিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠেছিল—আসছে! আসছে! এই—এই—এই। এই মেয়েলোক। কে গো তুমি—হটো—ভাগো- মিলিটারি আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে দৈত্য-দানার বাচ্ছার মত সব অদৃশ্য হয়ে গেল যেন। জাল দিয়ে মোড়া লরি চলে গেল ; গলির মুখটা পার হবার সময় যেন ঢেলার শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। লরির উপর থেকে এল বন্দুকের গুলি। শান্তি ভয়ে বসে পড়েছিল। শান্তির কপাল, একটা গুলি তাকে লাগল না! আর তার যেতে সাহস হল না। ফিরল সে।

নেবু এবং ছোট দুটোর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল। সে ভাবনা তার অহেতুক নয়। ফিরে দেখল—ছোট ছেলে দুটো ঘরের মধ্যে চিৎকার করছে, নেবু নেই। বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। নেবুকে সে জানে। ছ মাস আগে গোপেনের অসুখ করেছিল—কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল, নেবু রাত্রে গিয়ে দারোয়ানদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে একা। এ বছরের বর্ষায় বাগবাজারের ঘাট থেকে রাত্রি ন'টায় খদ্দেরের ভিড় কমে গেলে সস্তায় ইলিশ কিনে এনেছে। এক-একদিন সস্তা মাছের খোঁজে গঙ্গার ধারের ওই অন্ধকার পথে আহিরীটোলার ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে তার নেবু। ঘরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে তার আর সন্দেহ রইল না—রান্নার হাঁড়ি-কড়াইগুলি উপরে তুলে রাখা হয়েছে, বঁটিটাও তুলে রেখেছে, যে জিনিসগুলি ভাঙতে পারে—তাও সযত্নে সামলে রেখেছে। তারপর আর তার সন্দেহ রইল না। সে ডাকিনী এই খেপে-ওঠা কলকাতার রাস্তায় এই রাত্রিকালে বেরিয়েছে দেবা আর ট্যাবার সন্ধানে। সন্ধানেও বটে—আবার এই হানাহানি খুনাখুনি দেখবার নেশাতেও বটে।

শান্তি বেরিয়ে এসে পথের উপর কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বসে পড়ল ওই দাওয়াটার উপর।

রাত্রি দশটায় ফিরল দেবা আর ট্যাবা। দুজনের কাঁধে দুটো পুঁটুলি। এই দুরন্ত শীতের দিনে খালি গা, গায়ের জামা খুলে তাই দিয়ে পুঁটলি বেঁধে কি নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটো এসে মাকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। শয়তান, প্রেত, অপোগণ্ড হতভাগাদের ভয় হয়েছে এবার। ফিস্-ফিস্ করে দুজনে কি বলাবলি করছে। শান্তির মনে দুর্দান্ত রাগ ক্ষোভ, জ্বলন্ত-প্রায় কয়লার উনোনের উত্তপ্ত ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে—ওদের দুটোকে মাটিতে ফেলে দুজনের গলায় দুটো পা দিয়ে নূতন সন্তানঘাতিনী একাদশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে। তারপর বের হয় নাচতে নাচতে, সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলতে। নখ দিয়ে চিরে, দাঁত দিয়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে সমস্ত সৃষ্টিটাকে টুকরো টুকরো করে দিতে। মধ্যপথে গুলি এসে লাগে তার বুকে—ব্যস, সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে যায়। সে উঠল।

—আয়—আয়—এদিকে আয়। শোন!

পিছিয়ে গেল ছেলে দুটো। ওরা বুঝতে পেরেছে—শান্তির বুকের আগুনের আঁচ পেয়েছে। চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বোধ হয় উঁকি মারছে।

এগিয়ে গেল শান্তি, দেবা ট্যাবা ছুটে পালিয়ে গেল খানিকটা। গাঢ় অন্ধকার একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। শান্তি আরও এগিয়ে এলে তারা ঐ গলির মধ্যে ঢুকবে। ঝিয়েদের বস্তীর গলি। বড় হয়ে তো ওইখানে ওরা ঢুকবে। ঠেলা মেরে শান্তি গোপেনকে যে ভদ্রপল্লীর পাকা-বাড়ি থেকে ভাগের পাকাবাড়ি, সেখান থেকে টিনের কোটা-বাড়ি, সেখান থেকে ঝিয়েদের বস্তীর সামনের এই বস্তীতে এনে ঢুকিয়েছে—সে-ই ওই দেবা ট্যাবা হাবা সবাইকে ওই ঝিয়েদের বস্তীতে ঠেলবে—তারা ওই ঝিয়েদের সঙ্গে সংসার পাতবে। তার পর ওখান থেকে পিছু হটে যাবে ওই পিছনের বস্তীতে—বেশ্যাপল্লীতে, গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবে ছুরি হাতে অথবা ব্লেড কি কাঁইচি হাতে। রাহাজানি কি খুনে কি পকেটমার হবে। নেবুও যাবে বোধ হয় ওইখানে। তা ছাড়া আর কোথায় নেবুর গতি!

আজ এই মুহূর্তে শান্তির চোখে কোন রঙ নেই, অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভবিষ্যৎ। সাধারণ সময়ে সে নেবুর বিয়ের কল্পনা করে। পাড়ার ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে বিয়ে করবে। ওই বড় বড় বাড়ির ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে ফেলবে না—কে বলতে পারে? অসম্ভব কিসে? এই তো সিনেমায় সে দেখেছে—বস্তীর মেয়ের সঙ্গে লক্ষপতির ছেলের বিয়ে হচ্ছে। লক্ষপতির মেয়ে বস্তীর বাউণ্ডুলেকে বিয়ে করছে। আবার কল্পনা করে—নেবু গান শিখছে—কোন মতে রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পাবে নেবু, তার মিষ্টি গলার গান শুনে কেউ হয়তো নেবুকে চিঠি লিখে বিয়ে করে ফেলবে। আবারও কল্পনা করে, নেবু সাহসী মেয়ে—দেখতেও তার শ্রী আছে—চটক আছে—পথে-ঘাটে ঘুরতে-ঘুরতে গিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হবে, বাড়িতে আসবে-যাবে—তার পর বিয়ে হবে।

আজ তার সে-সব কোন কল্পনার ঘোর নেই। সে স্পষ্ট দেখছে নেবুর ভবিষ্যৎ। নেবুর বয়স বাড়বে, বিয়ে হবে না, অকস্মাৎ একদিন প্রকাশ পাবে নেবুর সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের আভাস। নয় তো হঠাৎ এক দিন দেখা যাবে—নেবু নিরুদ্দেশ। তার পর নেবুকে একদা দেখা যাবে ওই পল্লীতে।

সময়ে সময়ে শান্তি কল্পনা করে নেবু সিনেমায় নামবে। কত ভদ্রঘরের মেয়ে সিনেমায় নামছে ; উপার্জন করছে ; দেওয়ালে-দেওয়ালে তাদের ছবি, হাজার হাজার টাকা উপার্জন, বাড়ি-গাড়ি, গহনা-শাড়ি, কিছুরই অভাব নেই তাদের—লোকের মুখে মুখে তাদের নাম। অমনি হবে নেবু। আজ মনে হল সিনেমাতেও যদি বা স্থান পায় নেবু, তবে সে স্থান পাবে সিনেমায় যারা ঝি সাজে, বস্তীর মেয়ে সাজে—তাদের মধ্যে ; ওই যে কদর্য পল্লীটা, ওর সামনেও মধ্যে মধ্যে সিনেমার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, ওখান থেকে মেয়েদের বেছে-বেছে নিয়ে যায় ; সেখানে চা খায়—জলখাবার খায়—দু'টাকা করে মজুরী পায়—গাড়ি চড়ে যায়—গাড়ি চড়ে ফেরে।

ভাবতে ভাবতে শান্তির রাগ-ক্ষোভ হতাশায় পরিণত হল। কালবৈশাখীর ঝড়-মেঘ-বজ্র ক্রমে যেমন আষাঢ়ে মন-উদাস-করা বর্ষার মেঘে রূপান্তরিত হয়—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত নিরন্ধ্র মেঘে ঢেকে যায়—ঝর ঝর করে অবিরল কান্নার মত বৃষ্টি নামে—তেমনি ভাবে বুক-জোড়া বেদনার মেঘে রূপান্তরিত হল শান্তির ক্রোধ-ক্ষোভ, চোখ জলে ভরে উঠল—চোখ ছাপিয়ে দুটি ধারায় ক্রমে সে জল নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেঁদে—সে কোন মতে আত্মসম্বরণ করে—ধরাগলায় কাতর ভাবে ডাকলে—ওরে আয়—বাড়ি আয়—আর দুঃখ দিস নে। ওরে দেবা—ওরে ট্যাবা। শেষের ডাক দুটির মধ্যে কান্নার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

দেবা ট্যাবা উঁকি মারলে গলি থেকে।

—ফিরে আয়—আমার মাথা খা।

দুই ভাই এবার রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

—আয় রে, কিছু বলব না—আয়। আর কেলেঙ্কারি বাড়াস নে।

কেলেঙ্কারি বই কি। এমন ছেলে—আর ভদ্রলোকের মেয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই ডাকা—কেলেঙ্কারি বই কি! ভাগ্য শান্তির—সামনের দোকানগুলো বন্ধ; রাস্তায় আজ নারীদেহলোলুপ মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। নইলে তেরচা চোখে চেয়ে চলতে চলতে কেউ হয়তো—সশব্দে গলা পরিষ্কার করে ইঙ্গিত করত, কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলত—কি গো—

খুনোখুনি হাঙ্গামার মধ্যে কলকাতার মানুষের মতি ফিরেছে। মানুষের ভাগ্য না হোক—শান্তির কাছে সেটা আজ ভাগ্যের কথা।

দেবা ট্যাবা এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

* * *

শান্তি ওদের মারলে না। মারতে ইচ্ছা হল না। নেবুর মৃত্যুশোক বুকের মধ্যে চেপে হতাশার অবসাদে অবসন্ন হয়ে সেই দাওয়ার উপর বসে পড়ল।

দেবা ট্যাবা সাহস পেয়ে দেখালে—তাদের পুঁটুলির জিনিস। পোড়ানো লরির পার্টস্। লরিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—।

—জানো মা—প্রথমেই গাড়ি থেকে খানিকটা পেট্রোল বার করে নিয়ে—টায়ারের উপর ঢেলে দিচ্ছে। ব্যস, তার পরই দেশলাই। পেট্রোলে আগুন লেগে—হু হু করে জ্বলছে—টায়ারের রবার গলে যাচ্ছে—তখন সেই থেকে আগুন জ্বলছে। তখন সট সট করে—লরির ঘড়ি মিটার ব্যাটারী খুলে নিচ্ছে। তারপর ট্যাঙ্ক ফেটে পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে—খুব আগুন জ্বলছে।

ওরা দু ভাইয়ে দুটো ঘড়ি নিয়ে এসেছে। ট্যাবা বললে—হাঙ্গামা মিটলে বিক্রি করে দোব।

শান্তির এতে খুশী হবার কথা। এর আগে মূল্য আনতে পারে এমন জিনিস আনলে সে খুশীই হয়েছে। ওই ট্যাবাটা মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের প্রেস-রুমে ঢুকে কতকগুলো ব্লক চুরি করে আনত। গোপেন সেগুলো বিক্রি করে কিছু মূল্য ঘরে এনেছিল। শান্তি মধ্যে মধ্যে ট্যাবাকে বলে—একদিনে বেশী আনবি নে, একটা দুটো—তার বেশী নয়। নইলে ধরে ফেলবে। পাড়ায় খাওয়ান-দাওয়ান থাকলে দেবা ট্যাবা দুজনেই যায়—সুযোগ মত জুতো নিয়ে আসে। সেটা ওদের শিখিয়েছিল—নেবু।

হতভাগী নেবু।

এই সময় ফিরল গোপেন। একখানা সেলুন বডি মোটর এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে একটি লম্বা দেখতে জোয়ান ছেলে আর একটি হাল-ফেশানী মেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাওয়ায় এসে বসে গোপেন বললে—এই আমার বাড়ি। ব্যস্, বলে ধপ করে দাওয়ার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বললে—জয় হিন্দ!

মেয়েটি হেসে হেসে বললে—জয় হিন্দ। কিন্তু কাল যেন আর বাড়ি থেকে বার হবেন না।

—ও কিছু না! বলে গোপেন বাঁ পায়ের কাপড়টা সরালে—পায়ের ডিমেটায় একটা ব্যাণ্ডেজ!

—কিছু না নয়, কাল বুঝতে পারবেন। বিশ্রাম নিন কাল। জ্বর-টর হলে ডাক্তার দেখাবেন। পারি তো আমরা কেউ আসব ডাক্তার নিয়ে।

তারা চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্তি মাটির মূর্তির মত। তার মুখের ভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল—যা দেখে গোপেন তাকে একটু তোষামোদ না করে পারলে না। হেসে বললে—পায়ের ডিমেতে রিভলভারের গুলি লেগেছে।

শান্তি কোন উত্তর দিলে না।

গোপেন এবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—নেবু, নেবু রে!

শান্তি এবার বলে উঠল, পাগলের মত—নেবু, নেবু, নেবু! নেবু নেই—নেবু মরেছে।

* * *

শেষ রাত্রে শান্তি ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরের এই হাতখানেক চওড়া রোয়াকটায় বসে—ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঠাণ্ডা মাটিতে ঠেস দিয়ে—নেবুর চিন্তার উদ্বেগ বুকে নিয়ে তার ঘুম আসাটা আশ্চর্য। কিন্তু তবু ঘুম এল ; বসে থাকতে থাকতে কখন আপনিই চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এল। সজ্ঞানে যে সব রোগী মরে, বাঁচবার ব্যগ্রতায় অহরহ পাশের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়িতশক্তি হয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে বিনা আক্ষেপে এক সময়ে চরম অবসাদে চোখ বন্ধ করে, তেল ফুরানো প্রদীপের শিখার নিবে যাওয়ার মত চেতনা হারিয়ে ফেলে, শান্তির ঘুম আসাটা ঠিক তেমনি ধরনের। ক্রমশঃ মাথার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল—ঝিম ঝিম করতে আরম্ভ করলে—হাত-পায়ের পেশীগুলো নরম হয়ে এল—নিজের দেহটা ভারী বোধ হতে লাগল, বুকের ভিতরে উদ্বেগের অসহনীয় পীড়ন কম অনুভব করতে লাগল, নেবুকে যেন ভুলে যেতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে, পথের দিকে যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল, সে দৃষ্টি ক্রমে নিস্পৃহতায় বাহ্যবস্তু-প্রতিবিম্বিত-করার শক্তি হারিয়ে ভাবলেশহীন হয়ে এল, চোখের পাতা দুটো নেমে এল। তবু বার কয়েক জোর করে সে চোখ মেলবার চেষ্টা করলে, বার কয়েক চোখের পাতা খুললে, তারপর আর সে শক্তি রইল না, দৃষ্টি আর খুললে না। নাকের নিশ্বাস তখন ভারী হয়ে এসেছে।

গোপেনের কিন্তু ঘুম এল না। পায়ে গুলি লেগেছে, সেই যন্ত্রণা তাকে জেগে থাকতে সাহায্য করেছে। ক্রমাগত বিড়ি টানছে আর বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। নেবুর অন্তর্ধান সম্পর্কে ক্রমশ তার অন্য রকম ধারণা হচ্ছে। শান্তি বলেছে—নেবু, দেবা-ট্যাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে ফেরেনি। গোপেনের মনে হচ্ছে—নেবু নিশ্চয় কারও সঙ্গে ঘর থেকে চলে গিয়েছে। সন্দেহ হয়েছিল এ বাড়ির কানুটার উপর। কিন্তু কানুটা ফিরে এল। তার সাজপোশাক-চেহারা দেখে গোপেন বুঝতে পারলে—নেবুকে নিয়ে বিলাস-ব্যভিচার করতে যাওয়ার মত পোশাকও তার নয়—চেহারাও তার নয়। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আজ দু দিন সে ঘুরছে, সে দেখলেই বুঝতে পারছে. এর বুকে এই মাতন লেগেছে কিনা! গাজনের ভক্তদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, গলার উত্তরী, হাতের বেত, গেরুয়া কাপড়, কপালে রক্তচন্দনের ছাপ দেখে যেমন চিনতে ভুল হয় না—তেমনি কানুর সর্বাঙ্গেও সে এই গাজনের ভক্তসাজের ছাপ দেখতে পেয়েছে। তবে? মনে হল—নেবু হয়তো দেবা ট্যাবাকেই দেখতে বেরিয়েছিল—অন্ধকার জনবিরল পথে দুষ্ট লোকের দল কিশোরী মেয়ে দেখে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটা তার হু হু করছে। পায়ের যন্ত্রণা, বেদনা সর্বাঙ্গে স্নায়ু-শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে। অসহনীয় ক্ষোভে-আক্রোশে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠছে সে—আ—আ। সুদীর্ঘ উচ্চারণে আক্ষেপ-আক্রোশভরা—আ—অথবা—হা—, ঠিক বোঝা যায় না। তার পর ফেলছে সে একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস—হু—। কাল সে বার হবে আবার—একটা ছোরা চাই। প্রচণ্ড অনুশোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে—রিভলবারটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এল সে।

মনে পড়ে যায় মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে। নেবু চলে যাওয়ার লজ্জাজনক এবং ক্ষোভজনক স্মৃতির মতই ওই মেয়েটি ,এবং ছেলেটির স্মৃতি তার কাছে অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত মেয়ে—অদ্ভুত ছেলে। গল্পের ছেলে মেয়ে যেন। অথচ মনে হচ্ছে চেনা মুখ, অত্যন্ত চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে ঠিক করতে পারছে না, কিন্তু নিশ্চয় দেখেছে, বহুবার দেখেছে। সিনেমার সামনে কি এসপ্ল্যানেডে, কি গোলদীঘির ধারে সিনেট হাউসের সিঁড়িতে বা সামনে, কি কফিহাউসের দরজায়, কি ট্রামে বা বাসে এক সিটে পাশাপাশি দেখেছে ওদের।

ছেলেটির মুখে সিগারেট, চকচকে ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরনে শান্তিপুরে ধুতি—পাঞ্জাবি অথবা পেণ্টালুন—হাফশার্ট—কাবলী স্যাণ্ডেল অথবা পাজামা—কামিজ—জহরকোট ছিল; মেয়েটির পরনে দামী রঙীন অথবা সাদা তাঁতের শাড়ি—রেশমী ব্লাউজ—হিলতোলা জুতো ছিল—সামনেটা ফাঁপিয়ে চুলের পারিপাট্য, পিঠের দিকে বেণী অথবা ঢলঢলে আলগা খোঁপা কি এলো খোঁপা; মুখে পাউডার—কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগ, দু-এক সময় বেঁটে ছাতাও যেন থাকে হাতে। হাসিতে কৌতুকে ফেটে পড়তে দেখেছে, কি গল্পগুজবে মত্ত দেখেছে—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, কি দেশবন্ধু পার্কের মিটিংয়ে—মনে করতে পারছে না। হঠাৎ মনে হল ডকের মজদুরদের মধ্যেও এদের ঘুরতে দেখেছে। উস্কোখুস্কো চুল আধময়লা পোশাক—হাতে ঝাণ্ডা। ঠিক ঠাওর হচ্ছে না—কিন্তু বহুবার সে এদের দেখেছে। হঠাৎ মনে হল—খিদিরপুর থেকে কালীঘাট হয়ে আসবার সময় বড় জেলখানাটায় ফটকের ধারে এদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে; ফুলের মালা হাতে নিয়ে কারুর জন্যে দাঁড়িয়েছিল, কি ওরাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না তার। অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব পোষণ করতো সে এতদিন এদের সম্পর্কে; ছেলেটিকে বলত—নটবর, মেয়েটিকে বলত বিরহিণী। আজ কিন্তু সব ধারণা পাল্টে গেল তার। যাদের মনে করত ছাই—তাদের ছুঁয়ে বুঝতে পেরেছে—ছাইয়ের তলায় গনগনে আগুন ধ্বক-ধ্বক করছে।

ভবানীপুরে জগুবাজারে ওদের সঙ্গে দেখা।

আজ সকালে পাড়ায় লোকের হায় হায় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে উঠেছিল গোপেন, বাড়িতে ছোট বাচ্ছা দুটো ছাড়া কেউ ছিল না। ঘরে ছিল শেকল লাগানো। খুলে দিলে একজন পড়শী। তারই কাছে শুনলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় গুলি চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে পড়েছিল।

শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। মঙ্গলবার রাত্রে সে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর আগুন দেখে, মাথায় ঢেলা খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সেই থেকে কালীঘাট তাকে টানছিল।

ভবানীপুরে জগুবাজারে এসে সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় ব্যারিকেড। ফুটপাথে—একটা রাস্তার জংশনে চার মাথায় মানুষ জমেছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চোখে পড়ল এখানে-ওখানে শিখের দল—বাচ্চার দল। ঢেলা হাতে তৈরি। একখানা লরি পুড়ে গিয়েছে—এখনও অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে; গুর্খা পুলিস কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে গিয়েছে। একবার লাঠিও চালিয়েছে।

গোপেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। আর না এগিয়ে এইখানেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সর্বপ্রথম সে সংগ্রহ করে নিলে একটা পোড়া, লরি-ভাঙা লোহার মজবুত ডাণ্ডা। এরই মধ্যে গোপেন ছেলেটিকে দেখলে। এক সময় গোপেন চিৎকার করছিল পাগলের মত। হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল ছেলেটি, বললে—এ রকম চিৎকার করে না। ডিসিপ্লিন না হলে কাজ হয় না। স্থির হয়ে থাকুন।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলে গোপেন, বিরক্তি ছিল না ছেলেটির মুখে। হাসিমুখেই কথাগুলি বলছিল সে।

দুটোর পর আসর জমে উঠল। লোক জমল বেশী। শীতের দিনে শীত কেটে গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে ইট পড়তে লাগল। পুলিসের লরি আসে কিন্তু

ঐ ইটের মধ্যে দাঁড়াতে পারে না, দ্রুত ফিরে যায়। গুলি চলল একবার। লাগল দুজনকে। আঘাত সামান্য। তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। আবার খানিকটা যেন ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আর পুলিস মিলিটারীর লরি আসছে না। গোপেন চঞ্চল হয়ে পড়ল এবার। গোপেনের পেট জ্বলছে। সকাল থেকে পেটে দানা পড়ে নি, পকেটে মাত্র দু আনা পয়সা। লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে গোপেন গলি গলি খানিকটা গিয়ে ভিতরের দিকের কোন রাস্তার ধারের চায়ের দোকান খুঁজছিল। আর খুঁজছিল চানার দোকান অথবা তেলেভাজার দোকান! দেশী চপ, দেশী কাটলেট, আলুর বড়া আর বেগুনি।

হঠাৎ নজর পড়ল একটা সরু গলির মোড়ে ছেলেটি কথা বলছে মেয়েটির সঙ্গে। একটা কিছু গভীর আলোচনা চলেছে, কৌতুক নয়—হাসি নয়। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেন সম্ভ্রম প্রকাশ না করে পারলে না। হঠাৎ মেয়েটি ওকে ডেকে বললে—শুনুন।

—আমাকে বলছেন? গোপেন চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। মাথায় আপনার রক্ত পড়ছে, কিসে লাগল? ঢেলা?

সলজ্জ ভাবে হেসে গোপেন বললে—ওটা কাল লেগেছে ট্রামডিপো পোড়ানোর সময়। ব্যাণ্ডেজটা খুলে গিয়েছে। কারও হাতের কনুয়ের ধাক্কা লেগে গেল এখুনি।

—না—না। ওটা বেঁধে ফেলা উচিত। এক কাজ করুন আপনি—

হঠাৎ রসা রোডের উপর থেকে ভেসে এল জনতার চাপা গর্জন, লরির শব্দ, পিস্তলের গুলির আওয়াজ। জনতা সরে আসছে—গলির ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। ছুটে এল একটা ছেলে—একজন পড়ে গেছে গুলি খেয়ে, সার্জেণ্টরা নেমেছে রাস্তায়।

ছেলেটি দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল—রাস্তার দিকে।

মেয়েটি পিছন থেকে বললে—একটু কেয়ারফুলি।

ছেলেটি এবার একবার পিছন ফিরে একটু হাসলে শুধু। বললে—তুমি এস না কিন্তু! ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেল গিয়ে।

তবু মেয়েটি দু-চার পা এগিয়ে গেল, তার পর দাঁড়াল।

গোপেনও বড় রাস্তার দিকে ফিরল।

মেয়েটি বারণ করলে—না, যাবেন না এখন। দেখছেন না—সব লোক পিছিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছে? তা ছাড়া আপনার মাথায় জামায় রক্তের দাগ দেখলে এখুনি গুলি করবে।—এ কি?

তার কথাকে ঢেকে দিয়ে তাদের চকিত করে তুলে একটা পিস্তলের আওয়াজ উঠল: মেয়েটি বললে—এ কি?

ঠিক এই মুহূর্তটিতে—একটু আগে—অত্যন্ত কাছে গুলির শব্দ হল। বাঁ পাশের একটা ছোট রাস্তা থেকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে মোড় ফিরল একটা বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দ তুলে একটা গুলি গিয়ে লাগল রাস্তাটার ওপারের একটা বাড়ির দেওয়ালে—খানিকটা চুন বালি ইট খসে পড়ল। ভারী জুতোর দৌড়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। খুব বেঁচে গিয়েছে ছেলেটা।

মেয়েটি গোপেনকে বললে—লুকিয়ে পড়ুন। ছেলেটাকে ডাকলে—চলে এস আমার পিছনে, বাঁ পাশের গলিতে।

গোপেন ঢুকে পড়ল সরু গলিটার মধ্যে: বাঁ পাশে দুটো বাড়ির মধ্যে একফালি অন্ধকার জায়গা—সেইখানে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে সে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্তে গলির ভিতর ঢুকে গেল পলাতক ছেলেটা। তার পিছনে পিছনে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। গলির সামনে দ্রুত এগিয়ে এল ভারী বুটের আওয়াজ। এবার মেয়েটি ঢুকল গলির ভিতর। বুটের আওয়াজের মালিককে এবার দেখতে পেলে গোপেন। একজন সার্জেণ্ট-হাতে রিভলভার। মেয়েটি গোপেনকে অতিক্রম করে গলির ভিতরে চলে যাচ্ছে—তেমনি মন্থর পদক্ষেপে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

বুঝতে পারলে গোপেন—ছেলেটাকে পিছনের রিভলভারের নলের মুখ থেকে আড়াল করে চলেছে ও। অদ্ভুত বুদ্ধি—অদ্ভুত সাহস। বিস্মিত হয়ে গেল গোপেন। মেয়েদেরও ওরা যে রেয়াৎ করছে না—গোপেন আজই নিজে চোখে দেখে এসেছে পথে। আসবার সময় কলকাতা মেডিকেল ইস্কুলের হাসপাতালে ব্যাটনের আঘাতে আহত একটি ষোল-সতের বছরের মেয়েকে নিয়ে আসতে দেখেছে! এই এমনি ধরনের মেয়ে—এই জাত। তার নাম ঊষারাণী বসু। তাকে ভর্তি করবার সময় সে সেইখানেই ছিল। নামটা সে শুনেছে—মুখস্থ করে ফেলেছে। এ মেয়েটিও নিশ্চয় তা জানে। তবু পিঠের কাছে রিভলবারের নল নিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে চলেছে নির্ভয়ে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

—স্টপ। স্টপ—এবার চিৎকার করে উঠল সার্জেন্টটা।

মেয়েটি কিন্তু দাঁড়াল না।

—ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট, ইউ স্টপ—। আই সে—

মেয়েটি তবু দাঁড়াল না। কথা যেন কানেই যাচ্ছে না ওর।

—এবার আমি তোমাকে গুলি করব, দাঁড়াও। চিৎকার করে সার্জেন্টটা।

এবার গোপেনের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, লোহার ডান্ডাটা শক্ত মুঠোয় ধরে সে গর্জন করে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, ঠিক সার্জেন্টটার পিছনে। চকিত হয়ে সার্জেন্টটা গোপেনের দিকে ফিরতে চেষ্টা করতেই সে তার ওই ডান কাঁধেই বসিয়ে দিল লোহার ডান্ডাটা। অত্যন্ত শক্ত আঘাত।

লোকটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভারটাও হাত থেকে খসে মাটিতে ঠুকে পড়ে গেল গলির উপর। মুহূর্তে আওয়াজ হয়ে গেল, গুলিটা গোপেনের পায়ের ডিমের অল্প একটু মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। একটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল গোপেনের সর্বাঙ্গে। অদ্ভুত মেয়ে, সে গোপেনের হাত ধরে টেনে গলির মধ্যে ঢুকে এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে গেল একটা রাস্তায়। আবার গলি-গলি আর একটা রাস্তায়। তার পর ঢুকল একটা বাড়িতে। সম্ভবতঃ সেটাই এদের আড্ডা। আরও কয়েকজন সেখানে বসেছিল। তারাই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে এল ছেলেটি। খবর নিয়ে এল—একজন গুলি খেয়েছে, বরেন্দ্রকুমার দত্ত তার নাম। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। সেখানেই সে শুনলে—গত কাল সার্কুলার রোডের মোড়ে একটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে গুলি খেয়েছিল—বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছিল। কালই মারা গেছে হাসপাতালে ; নাম দেবব্রত। মরবার আগে সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল। হাসপাতালের নার্স তার অবস্থা দেখে চোখের জল সম্বরণ করতে পারে নি, কাঁদতে কাঁদতে সে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কাঁদছ কেন? আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য মরছি। এ মরণ তো ভাগ্যের মরণ। আমার দেশ—আমার দেশ স্বাধীন হোক।

গোপেন বার বার সেই কাহিনী স্মরণ করছে।

নেবু যেন গুলি খেয়ে মরে গিয়ে থাকে। গোপেনের মত বাপের ঘরের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি নিতে সে যেন দেশের জন্য মরে—দেশের পথের উপর পড়ে থাকে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার।

সকাল হয়ে আসছে। গোপেন উঠে দাঁড়াল। মরা নেবুর সন্ধানে যেতে হবে। কিন্তু এ কি—মাটি টলছে—সব ঘুরছে যে!

গোপেন দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু কই, কোথায় দেওয়াল? সে পড়ে গেল উপুড় হয়ে।

* * *

কানু সেই দরজার মুখে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। শীতের শেষ রাত্রির ঠান্ডায়

পথের কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কাতর সরীসৃপের মত পড়েছিল।

গাঢ় ঘুম নয়, অবসন্নতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও নেবুর জন্য চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; বুকের মধ্যের উদ্বেগও তাকে পীড়িত করছিল—অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর রোগযন্ত্রণার মত। ভোর বেলাতেই তার তন্দ্রা ভেঙে গেল ; ঠিকের ঝি পাড়াতে অতি নিকটেই থাকে, কাছের বাড়ির কাজ তারা সর্বাগ্রে সেরে দিয়ে যায় ; সেই ঠিকের ঝিয়ের চিৎকারে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। এমনি ভাবে দরজার গোড়ায় কানুকে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে চিৎকার করে উঠেছিল। কলকাতা শহর—এখানে মানুষের প্রাণের চেয়ে আর সস্তা কি? তার উপর এই খুনোখুনির দিনের কলকাতা—১৯৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ; গত তিন দিনে মানুষ মরেছে—গুলি খেয়ে জখম হয়েছে, এ ছাড়া খবর নেই। রকমারি গুজবে কলকাতার আকাশ-বাতাস ভরে রয়েছে। কানুকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঝি বেচারী ভেবেছিল—কেউ হয়তো কানুকে খুন করে গিয়েছে ; হয়তো রাস্তাতেই গুলি খেয়ে মরেছিল ছেলেটা, লোকজনে রাত্রে লাশটা এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। চিৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। চিৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে অর্ধসুপ্ত নেবুর কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিলে। মস্তিষ্কের স্নায়ুজালের মধ্যে উত্তেজনার শিহরণ বয়ে গেল ; শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতিতে বইতে আরম্ভ করলে। নেবু! নেবু! বিদ্যুৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিতের মত সে উঠে বসল।

বাড়ির ভিতর থেকে কানুর মা সাড়া দিলে—কে গা? কি? তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন কানুর জন্য। তবে কানু এমন অনেক দিন অনুপস্থিত থাকে রাত্রে। বারোয়ারী পুজোয় সে ভলেনটিয়ারী করে—রাত্রে ফেরে না। সরস্বতী পুজোয় তো কথাই নেই। কয়েক দিন ধরেই তার দেখা মেলে না। শিব-চতুর্দশীতে সারারাত্রিব্যাপী সিনেমা শোতে আটটায় গিয়ে সকালে ফেরে। মধ্যে মধ্যে পিক্‌নিকে যায়—সকালে গিয়ে ফেরে রাত্রি বারোটায়—কখনও কখনও ফেরে তার পরদিন। আবার কখনও রোগীর সেবা করতেও যায়। সারা রাত্রি জেগে সকালে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে। বলে—কি করব? সেবা করবার লোক নেই! পথে শুনলাম, দেখতে গিয়ে আর ফেরা হল না। মোট কথা, কানু যদি রাত্রে না ফেরে তবে ভাবনা-চিন্তা না করাটাই কানুর মায়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফিরতে দেরি হলে খাবার ঢাকা দিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়েন, কানুর ডাক শুনবার জন্য উৎকণ্ঠা পোষণ না করেই ঘুমোন, ডাকলে দরজা খুলে দেন, না-ডাকলে ঘুম ভাঙে যথানিয়মে সকালে, তখন মনে মনে কঠিন তিরস্কার করবার সংকল্প করেন, কঠিন কথাও অনেক ভেবে রাখেন মনে মনে, কিন্তু কানু ফিরলে আর কোন কথাই ওঠে না ; সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেন। এ সব সত্ত্বেও গত রাত্রে কানুর মা উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নি। কয়েক বারই তাঁর ঘুম ভেঙেছে। আজ ভোরে তাই ঘুম ভাঙতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়েছিল। ঝিয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে কানুর মা প্রশ্ন করলেন—কি গা? কি?

—আমি মা। দাদাবাবু দোর-গোড়ায় শুয়ে রয়েছে। আমি মা—ভয়ে বাঁচি না।

—হ্যাঁ গো। ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ওই—ও দাদাবাবু—চললে কোথা গো?

কানুর মা দ্রুতপদে এসে দরজা খুলে বেরিয়ে ডাকলেন—কানু—কানু। আবার যাচ্ছিস্ কোথায়?

—আসছি। রূঢ় কঠিন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিয়ে কানু বেরিয়ে চলে গেল।

নেবুর সন্ধান করতেই হবে।

রাস্তার মোড়ে রাইফেল্ নিয়ে ঘুরছে বৃটিশ টমি। সিগারেট ফুঁকছে। বড় বাড়িটার বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে দশ-বারো জন চেয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কানুর মনে হল—ঘৃণাভরা আক্রোশ ফুটে রয়েছে ওদের নীলাভ চোখে। এইবার সে দাঁড়াল—তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বিমল—নরেন—এদের ডাকতে হবে। সকলে যাবে। পাতি-পাতি করে খুঁজে যেখান থেকে হোক বার করবে

নেবুকে।

পাঁচ-মাথার মোড়ে গোলাকৃতি জায়গায় গুর্খা-পুলিস পাহারা দিচ্ছে। কানুর মাথার ভিতরটা ক্ষোভে রাগে কেমন হয়ে উঠল। নির্যাতিত ঘোড়া যেমন অকস্মাৎ বিদ্রোহে রাশ-যুতি টান মেরে ছিঁড়ে গাড়ির সঙ্গে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে লাফ দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলে সামনের সকল কিছুকে মাড়িয়ে—ধাক্কা দিয়ে—তেমনি বিদ্রোহ জেগে উঠছে যেন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে, উদ্বিগ্ন মনের মধ্যে।—শালাঃ। থমকে দাঁড়াল কানু। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে আপনার মনে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ হয়ে—নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে একখানা গাড়ি এল। কংগ্রেস-লীগ ঝান্ডা পাশাপাশি বাঁধা। মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকার লাগানো। ঘোষণার শব্দ অনেকটা দূর থেকেই শোনা গেল। কানু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গাড়িতে দুজন লোক—একজন হিন্দু একজন মুসলমান—সামনে ড্রাইভার এবং আর একজন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। চার জনের বেশী একসঙ্গে থাকলে বে-আইনী হবে। এগিয়ে এল গাড়িখানা।

"কংগ্রেস এবং লীগের কর্তৃপক্ষ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন—আপনারা এই ধরনের উন্মত্ততা থেকে ক্ষান্ত হোন। এতে আমাদের ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে। বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে। আপনারা রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে জনতার সৃষ্টি করবেন না। কোন প্রকার হিংসাত্মক কাজ করবেন না, কাউকে করতে দেখলে তাকে বারণ করবেন—নিরস্ত করবেন তাকে।"

গাড়ি চলে গেল।

কানু বসে পড়ল একটা দোকানের সিঁড়ির উপর। হতাশার অবসাদে সে যেন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ল। চারিপাশে ফুটপাথ আজ প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনে প্রশস্ত রাজপথে আজ কয়েক দিন ঝাড়ু পড়ে নি—ধুলোয় আবর্জনায় পথটা সমাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। শীতের সকালে উত্তরের বাতাসে খড়-কুটো ঝরাপাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ধুলো উড়ছে মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ একদল লরি এসে পড়ল গর্জন করে। একসারি মিলিটারী লরি। আর্মার্ড কার। ইস্পাতের ঘরের মত গাড়ির বডির ছাদে একটা গোল গর্ত থেকে এক-একজন সৈনিক টমিগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম গাড়িখানার ড্রাইভারের পাশে একজন শহরের বড় একখানা ম্যাপ খুলে বসে আছে। তারই নির্দেশ মত গাড়ির সারি চলছে। মোড়ের মাথায় এসে তিন ভাগ হয়ে গেল গাড়ির সারি। এক ভাগ চলে গেল সার্কুলার রোড ধরে, এক ভাগ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হয়ে গিয়ে পড়বে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে। এক ভাগ চলে গেল নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে। ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে। চারিদিকে সতর্ক সদর্প দৃষ্টিতে চেয়ে চলেছে।

কানুর দৃষ্টিতেও দেখতে দেখতে ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। পা দুটো যেন কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠল। বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে হচ্ছিল—কিন্তু চলল সে মানিকতলার দিকে।

কই নেবু? কোথায় নেবু!

রাত্রের অন্ধকারে দেখা—তবু চিনতে পারলে কানু। হ্যাঁ, সেই কানুর মতই অস্থির হয়ে ফিরছে। ভয়—নিষেধ তার জীবনের গতিবেগের পথে অবরোধের সৃষ্টি করেছে—সেখানে ধাক্কা খেয়ে চারিপাশে ঘুরে ঘুরে—গতিবেগকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। ঠিক চিনলে কানু। কাল রাত্রে নেবুকেই এই ছোকরা বলেছিল—"লালবাজারমে হিন্দু-মুসলিম এক হো গয়া পাঁইজী". কানু তার হাত ধরলে। -'কাল রাত্রে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঢেলা ছুঁড়েছি আমি, চিনতে পারছ?'

চমকে উঠলো ছোকরা,—কে তুমি? চোখের দৃষ্টিতে চকিতে পর পর ফুটে উঠল—ভয়—অবিশ্বাস—হিংস্র আক্রমণোদ্যোগ। কিন্তু কানুর হাতের স্পর্শের মধ্যে চেপে ধরে আয়ত্ত

করবার চেষ্টা ছিল না—বরং ছিল শিথিল ভঙ্গির মধ্যে মিনতির স্পষ্ট প্রকাশ। নইলে হয়তো কিছু ঘটে যেত।

কানু বললে—আমার সঙ্গে সেই শিখের ছেলেটি ছিল। যাকে তুমি বললে—পাঁইজি, লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এক হো গয়া!

সে স্থিরদৃষ্টিতে কানুর দিকে চেয়ে বললে—ঝুট বাত! শিখের ছেলে?

—শিখের ছেলে নয়, সে মেয়েছেলে। বল সে কোথায়? কাল রাত্রে এখান থেকেই আর তাকে পাইনি। বল—।

—নাম কি তোমার?

—কানু। কানাইলাল বোস।

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে—তোমার নাম করেছিল সে। একবার হোঁশ হয়েছিল—মরবার ঘন্টাখানেক আগে।

—নেবু—? নেবু নেই? মরে গিয়েছে?

—পেটে গুলি লেগেছিল।

—কিন্তু—মরা-নেবু কই? কোথায়?

—দেখবে। কিন্তু সে এখন নয়। সন্ধ্যের পর।

রাত্রি দশটারও পর ইসমাইল তাকে দেখাতে নিয়ে গেল নেবুর মৃতদেহ। দশটার পর কানুকে সঙ্গে নিয়ে খালের ধারের দিকে চলল। সমস্তটা দিন কানু ইসমাইলের সঙ্গ ছাড়লে না. ইসমাইলই তাকে খাওয়ালে। অন্ধকার খালের ধারে একটা নির্জন স্থানে—এসে দেখে—ঠাওর করে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। বললে—দোস্ত, বিশ্বাস করো আমার কথা—খোদাতালার নাম নিয়ে আল্লা রসুলের নাম নিয়ে তোমাকে বলছি—সে ঠিক এই গাছটার সামনে বরাবর খালের জলের মাঝখানে আছে।

কানু তার হাত ধরে বললে—কি বলছ তুমি? ওইখানে ফেলে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। কি করব? অজানা অচেনা তার উপর মেয়েছেলে। কবর দিতে গেলে-সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই—সনাক্ত চাই—নাম লেখাতে হবে! একা তোমাদেরই ওই মেয়ে নয়—আমাদেরও একজনকে ওখানে দিতে হয়েছে। ফেরারী আসামী ছিল সে।

কানু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারের মধ্যেও ইসমাইল অনুভব করলে সেকথা। সে বললে সমঝ করো ভাই। আমার বাত বিশ্বাস করো।

কানু হঠাৎ নামতে লাগল—খালের পাড় ভেঙে জলের দিকে অগ্রসর হল। ইসমাইল তার হাত চেপে ধরলে—বললে—না।

—ছাড়। আমি দেখব।

—না। আমিও দিনের বেলা ভেবেছিলাম—আমিই জলে নেমে তুলে তোমাকে দেখাব। কিন্তু সে হয় না। খালে ছোট ইস্টিমার চলে—কত জল জানি না। সে হয় না। আমি ঝুট বলি নি তোমাকে। আমার ইমানদারিতে তুমি বিশ্বাস করো। এস, ফিরে এসো।

কানু হঠাৎ ইসমাইলের মুখের উপর হাত দিলে। গরম জলের স্পর্শ লাগল তার এই শীতের রাত্রের কনকনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা আঙুলের ডগায়। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ কানু বললে—চল।

কলকাতার প্রান্তসীমায় খালের ধারের ধুলায় আচ্ছন্ন পথ. মাথার উপরে দু'পাশে বড় বড় গাছের আচ্ছাদন,—গ্যাস-লাইটগুলোর অধিকাংশই জ্বলছে না; ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের উন্মত্ত কলকাতার পথে, বিশেষ করে এই জনবিরল পথে আলো জ্বালাবার জন্য কর্পোরেশনের উড়িয়া শ্রমিকেরা আসে না: বিদ্রোহের উত্তাপ তাদের বুকেও লেগেছে—সেই উত্তাপে তাদের মনও আজ দৈনন্দিন কর্মের দিকে নেই: বিদ্রোহের উত্তাপের সঙ্গে ভয়ও আছে—এই দুই বিপরীতধর্মী ভাব মিশ্রণের ফলে তারা মাত্র খালের উপর ব্রিজ-গুলির ধারে আলো জেলে দিয়ে এ পথে আর অগ্রসর হয় নি—আপন আপন আড্ডায় ফিরে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করেছে। এতক্ষণ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

বড় বড় গাছে-ছাওয়া আলোকহীন অন্ধকার পথ। তারই মধ্যে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী ছেলে চলেছে। ধুলার অনেক নীচে পাথরে বাঁধানো রাস্তার অস্তিত্ব—সেই পথের উপরে তাদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নেই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নেই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ পাহারা থাকে তাও নেই। আজ তিন দিন বিদ্রোহী কলকাতার শক্তির কাছে পুলিস-শক্তি পরাভব মেনে পিছু হটেছে। অনেক বিজ্ঞ জনে সন্দেহ করেন—দেশীয় পুলিসের মনও আজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন। কেন হবে না? তারাও তো এই দেশেরই মানুষ। সেই জন্যেই তাদের সরিয়ে কর্তৃপক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট গুর্খা-পুলিস এবং গোরা পল্টনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহ-দমনের শক্তিপ্রয়োগের অধিকার। তাদেরও কিন্তু এই অন্ধকার জনহীন খালের ধারের দিকে আসবার সাহস হয় নি। বড় রাস্তা ছাড়া কোন গলির মধ্যে তারা ঢোকে না। পিস্তল হাতে নিয়েও না ; মানুষ আজ যেখানে মরতে ভয় পায় না, সেখানে পিস্তলের দাম কমে গিয়েছে এবং মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ায় তাদের শক্তির মূল্য বেড়েছে। যেখানেই অস্ত্রের অহঙ্কারে পুলিস গলির মধ্যে ঢুকেছে, সেখানেই অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, হয় পালিয়ে আসতে হয়েছে অথবা নির্যাতিত হতে হয়েছে। মার খেয়েছে—টুপি কেড়ে নিয়েছে—পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে। একটি সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, লেক অঞ্চলে টহল দিতে গিয়ে দুজন সার্জেণ্ট ফিরে আসে নি ;—এক দল পুলিস তাদের অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পায় নি এখনও পর্যন্ত। সাতাশি জন পুলিশ আহত হয়েছে এই তিন দিনে। আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মুখর কলকাতা অন্ধকার শঙ্কায় ক্ষোভে থম-থম করছে। নিজের মনের প্রতিফলনে স্তব্ধ কলকাতার বস্তী থেকে আরম্ভ করে রুদ্ধদ্বার বড় প্রাসাদগুলির অবরুদ্ধ শোকার্ততায় নিষ্ফল ক্ষোভে বিষণ্ণ এবং বাক্যহারা হয়ে ঊর্ধ্বমুখে শূন্যলোকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে বলে মনে হল ইসমাইল এবং কানুর।

বরেণ্য দেশনায়কের সতর্কবাণী নিষেধাজ্ঞায়, নিরস্ত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের শাসনে মানুষ বল হারিয়ে ফেলেছে, অভিভূত হয়ে শিথিল-পেশী হয়ে পড়েছে বিদ্রোহ। যে কলকাতা উন্মত্তের মত বিকৃত মুখে রক্তচক্ষে উদ্ধত মস্তকে শিকল ছিঁড়তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে এই নিষেধাজ্ঞায়—শাসনের নির্মমতায় নতজানু হয়ে আবার বসে পড়েছে—মাথা নীচু করেছে। যে মাথা নীচু সে করেছে মাটির দিকে, নিবদ্ধ-দৃষ্টি সে মুখের ছবি স্পষ্ট যেন ভেসে উঠেছে কানুর মনে। অন্ধকারের মধ্যে ইসমাইলের মুখে হাত দিয়ে যেমন অনুভব করেছিল উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শ, তেমনি স্পর্শ কলকাতার নতমুখে হাত দিলেই পাওয়া যাবে।

ইসমাইল হঠাৎ দাঁড়াল—মৎ যাও ভাই। দাঁড়াও।

কানু চকিত হয়ে ইসমাইলের মুখের দিকে চাইলে।

ইসমাইল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—মোড় পর মিলিটারী। নওজোয়ান দেখনেসেই গোলি চালায়গা, নেহিতো এ্যারেস্ট করেগা।—

মানিকতলার মোড়ে গুর্খা-পুলিস এবং কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। সাধারণের দিক থেকে আক্রমণ আজ আর হয় নি, আক্রমণোদ্যোগ শিথিল হয়ে পড়েছে।

ঠিক কথা। ইসমাইল ঠিক বলেছে। কানু বললে আমি গলি-গলি চলে যাচ্ছি।

—আজ এখানেই রয়ে যাও না ভাই।

—না ভাই। সমস্ত দিনই তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। বাড়িতে ভেবে সারা হয়ে যাবে। হঠাৎ কানুর মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ। দ্রুতপদে সে গলি-পথ ধরলে।

* * *

পনেরই ফেব্রুয়ারী।

গোপেন উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল বাইরের সেই ফালি দেওয়ালটার উপর।

গতকাল একবেলা পুরো সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। দুপুরের পর চেতনা হয়েছে। চেতনা হলেও সে উঠতে পারে নি, ডাক্তার তাকে উঠতে দেয় নি। চেষ্টা করবারও অবকাশ হয় নি তার। বাকী সমস্ত দিনটা এবং রাত্রিটা তার অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গিয়েছে। গোপেনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দেই শান্তির ঘুম ভেঙেছিল।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট, তার দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগের আর অন্ত নেই ; হে ভগবান! কিন্তু ভগবানকে ডাকারও সময় ছিল না তার। গোপেনকে ধরে তুলতে হবে। সেও কি তার সাধ্য? দেবা ট্যাবাকে ডেকে তাদের সাহায্যেও সম্ভবপর হয় নি। দুজন ঝি যাচ্ছিল, তাদের ডেকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে এনেছিল। মুখেচোখে-মাথায় জল দিয়েও চেতনা হয় নি। অবশেষে ডাক্তার ডেকেছিল। নেবু খুলে রেখে গিয়েছিল তার কানের দুটো মরা সোনার টাপ, রুপোর চুড়ি চারগাছা—তাই বন্ধক দিয়েছে ওই ঝিয়েদের বস্তীর জগো মাসীর কাছে। জগো মাসী শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদছিল। তার কোলে-পিঠে করে মানুষ করা মেয়ে, গুলি খেয়ে মরেছে কাল। গণেশ টকীর কাছে বাড়ি তাদের-- তিনতলার উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে চোদ্দ বছরের মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে দেখছিল এই সংঘর্ষ। সম্ভবতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট রাইফেলের গুলি গিয়ে লেগেছে তাকে। জগোর ধারণা কিন্তু ইচ্ছে করেই গুলি করেছে। তবু সে শান্তির মুখ দেখে—তার ব্যাকুলতা দেখে টাকা দিয়েছে। টাকা দিয়ে বলেছিল—আর যদি দরকার হয় তবে নেবুকে পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিস না হলেও দোব।

শান্তির বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল—ওরে নেবু রে! আমার সোনার নেবু রে! কিন্তু নিজেকে সে সংযত করেছিল। কলঙ্ক—দুরপনেয় কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যাবে। নেবু ফিরে এলে ঘরে তার ঠাঁই হবে না। কথা প্রকাশ পেলে—আফিস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে গোপেনের চাকরি যাবে। জগোর কথার কোন উত্তর না দিয়েই সে একরকম ছুটে পালিয়ে এসেছিল। ডাক্তারের কাছেও সে সত্য কথা বলে নি। মাথায় ঢেলার আঘাত—পায়ে গুলির ক্ষত দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন—কি করে হল? হাঙ্গামায় মেতেছিল বুঝি?

—না।

—তবে?

মুহূর্তে শান্তির মাথায় এসে গেল মিথ্যা কথা। সে বললে—খিদিরপুর থেকে ফিরছিলেন—হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এদের ঢেলায় মাথা ফেটেছে, ওদের গুলি পায়ে লেগেছে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। ডাক্তার আর প্রশ্ন করেন নি। তিনি দয়া করে ভিজিটও নেন নি। ওষুধের দাম নিয়ে বলে গিয়েছেন—উঠতে দেবে না আজ। উঠতেও পারবে না, তা ছাড়া ঘুমের ওষুধ দিলাম।

জ্ঞান হওয়ার পর গোপেন জিজ্ঞাসা করেছিল—নেবু?

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

—ফেরে নি?

আবার মাথা নেড়েছিল শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ঘরের খাপরার চালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোপেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিরতিশয় ক্লান্তিতে, অবসাদে, ওষুধের প্রভাবে।

শান্তি উদ্বেগ-আকুল চিত্তে ঘরের দরজাটায় ঠেস দিয়ে বসে সমস্ত দিন কাটিয়েছে। এ-পাশে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অসুস্থ গোপেন—ও-পাশে পথ, এখান থেকে প্রায় মোড়টা পর্যন্ত দেখা যায়।

দেবা আর ট্যাবা বাপের ওই অবস্থা দেখে এবং মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আজ আর মাতনে মত্ত হতে যায় নি। বাইরেও আজ উৎসাহ নেই যেন। দেবা ট্যাবা বার-দুয়েক তবু ঘুরে এসেছে বড় রাস্তার মোড় থেকে। দুপুরেই গিয়েছিল দুবার। একবার একটায়,

একবার তিনটেয়। দুপুরে পরিশ্রান্ত শান্তিও ঘুমিয়ে পড়েছিল—গোপেনের অসুখ, নেবুর শোক তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে নি। স্নান করে দুটো ভাত মুখে দিতেই সে যেন অবশ হয়ে পড়ল ঘুমে।

নেবুর কথা তারা জিজ্ঞেস করেছিল শান্তিকে। শান্তি তাদেরও সত্য কথা বলে নি। বলেছে—কাল আমার বাবা এসেছিলেন দেশ থেকে—নেবুকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সঙ্গে। বর ঠিক করেছেন—বিয়ে দেবেন নেবুর।

—তোমার বাবা? দাদামশায়?

—হ্যাঁ।

দাদামশায় তাদের আছেন বটে। দাদামশায় আছেন, মধ্যে মধ্যে এ কথা তারা শোনে। কোন জেলায় কি গাঁয়ে যেন দাদামশায়ের বাড়ি; নদীর ধার, টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, সুপুরি নারকেলের বন সেখানে; কি যেন নাম দাদামশায়ের। হ্যাঁ—হ্যাঁ, নবকৃষ্ণ মিত্র। মহাজনের গদিতে খাতা লেখে।

বিকেল বেলা প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়েছিল নেবুর।

—কেমন আছে তোমার স্বামী? কই নেবুকে দেখছি না?

তাদেরও শান্তি ওই কথা বলেছে। হঠাৎ পাত্র ঠিক করে এসেছেন। কি করব? উনি বাড়ি নেই, দেবা-ট্যাবা বাইরে, এক ঘণ্টার বেশী ট্রেনের সময় নেই, নেবুকেই শুধু পাঠিয়ে দিলাম। এর পর আমরা যাব।

তারপর ঘরে খিল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে। তাও কি নিশ্চিন্তে কেঁদে বুক হাল্কা করার উপায় আছে! গোপেন অঘোর ঘুমের ঘোরে মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছিল—শান্তি চোখ মুছে তাকে নাড়া দিয়ে কপালে জল দিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙেছিল গোপেনের। শান্তি তখন ঘুমুচ্ছিল।

সকালে উঠে গোপেন বলেছিল—পুলিশে খবর দিই, কি বল?

শান্তি বলেছিল—তার পর? তোমার কাণ্ড যখন বেরুবে, দেবা-ট্যাবার কাণ্ড যখন বেরুবে—তখন? চাকরি যাবে—হাতে দড়ি পড়বে—তা ছাড়া মেয়েরই যে কি কাণ্ড বার হবে তাই বা কে জানে?

চুপ করে বসে রইল গোপেন—এর কোন জবাব দিতে পারলে না।

শান্তি বললে—আমি পাড়ায় বলেছি, আমার বাবা এসে নেবুকে নিয়ে গিয়েছেন। দেবা-ট্যাবাও তাই জানে।

* * *

সেই অবধি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে বিড়ি খাচ্ছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই—বুকের মধ্যে সে উন্মত্ততাও নেই। দেহে আঘাতের জর্জরতা—বুকে নেবুর জন্য অবরুদ্ধ শোকের হতাশা। পথে মানুষের জটলার মধ্যেও নিরুৎসাহের প্রভাব।

দেবা ট্যাবা মধ্যে মধ্যে বাইরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। ঘরের মধ্যে শান্তি আজ ভগবানকে ডাকছে।—হে ভগবান! এই করলে শেষে তুমি?

বার কয়েক শুনে গোপেন আর সহ্য করতে পারলে না, শান্তির ঐ কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকার মধ্যে যেন তারই প্রতি মর্মান্তিক তিরস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হল—ভাবে না হলেও অস্পষ্ট ভাবে সেটা অনুভব করলে। তাই সে বলে উঠল—আঃ ছি-ছি-ছি! চুপ কর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

দেবা-ট্যাবাও ক্রমে এই শোকাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কারণ না-জেনেও তারা অভিভূত হয়ে পড়ল স্তব্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে।

দিনে খেয়ে-দেয়ে গোপেন একটু সুস্থ হল। নানা উপায় সে ভাবতে লাগল। আঃ, সেই মেয়েটি আর ছেলেটির সঙ্গে যদি আর একবার দেখা হত! তারা কি আসবে?

কলকাতার এত ছেলে-মেয়ের মধ্যে কি সে আর তাদের খুঁজে বার করতে পারবে? তবে আবার যদি হাঙ্গামা বাধে—তবে হাঙ্গামার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তাদের দেখা পাবে, এ বিষয়ে গোপেনের কোন সন্দেহ নেই। গোপেন ভুল করবে না—নেবুর শোক তার বুকে গাঁথা রইল।

আঃ, একটা মানুষ নেই যে দুটো কথা বলে। গলির মোড় পর্যন্ত গেলে হয়। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, কানু এসে দাঁড়িয়েছে নিজেদের বাড়ির সামনে, গলিটার ভিতরের দিকে। সে ডাকলে—কানু!

কানু ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

—আজকের খবর কিছু জান?

মুখের উপর কোঁচার ডগাটা চেপে ধরেছে কানু, সম্ভবতঃ এখুনি সিগারেট খেয়েছে। মাথা নেড়ে কানু ইঙ্গিতে উত্তর দিলে—না।

—খবরের কাগজ নাও না তোমরা?

কানু নীরবেই চলে গেল, বাড়ি থেকে কাগজখানা এনে গোপেনের পাশে নামিয়ে দিলে।

অনেক খবর। শহরতলী অঞ্চলে হাঙ্গামার বিস্তার। বুধবারে কাঁকিনাড়া ও নৈহাটীতে চারখানা ট্রেন ভস্মীভূত করে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা; কাঁকিনাড়া স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। লাইনের উপর শুয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কাঁকিনাড়ায় গুলিতে মরেছে চার জন, চোদ্দ জন আহত হয়েছে। হাওড়ায় শালিমারে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করেছে। বুধবারে উন্মত্ত জনতা কলকাতায় একটি গির্জায় আগুন দিয়ে কাগজপত্র নষ্ট করেছে। কাল বৃহস্পতিবারে দমদমে গুলি চলেছে, এক জন নিহত, আট জন জখম হয়েছে। হুগলী-হাওড়া-বজবজ-ব্যারাকপুরের সমস্ত মিল বন্ধ ছিল। কলকাতা অপেক্ষাকৃত শান্ত। শুধু জগুবাজারে একখানা লরি পুড়েছে। মিলিটারী এসে গুলি চালায়; কেউ অবশ্য আহত হয় নি। জগুবাজারে মিলিটারী পিকেট বসেছে।

মুহূর্তে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ছবি। দীপ্তি ফুটে ওঠে তার চোখে। তার পর আবার দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে। কাগজখানা পাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কানু জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবেন?

—এই একটু—একটু দেখে আসি।

কানুও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দোকানপাট বন্ধ। রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। দু-চার জন মানুষ যারা চলেছে—তারা মাথা নীচু করে চলেছে। শ্যামবাজার বাগবাজারের সংযোগ-স্থলে লাইট-পোস্টে একটা পোস্টার ঝুলোনো রয়েছে। সাদা কাগজের উপর সবুজ কালিতে হাতে লেখা পোস্টার—"জনসাধারণের প্রতি নিবেদন"—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আবেদন জানিয়েছেন—"কলিকাতার অধিবাসীদের আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও শান্ত থাকিতে এবং গভর্ণমেন্টের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিবেদন করেছেন—"হিংসার পথে কেবল মর্মান্তিক এবং ব্যর্থ পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে পৌঁছিতে হয়—কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগুনের আক্রমণ আগুন জ্বালিয়া রোধ করা যায় না, আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জল ঢালিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অহিংস প্রতিরোধ। ...অনর্থক খণ্ড আন্দোলনে শক্তিক্ষয়ে মূল স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইবে।"

আর পড়তে পারলে না গোপেন। সে সরে এসে দাঁড়াল ফুটপাথের উপর। হে ভগবান্! তার সামনে দিয়ে সশব্দে চলে গেল মিলিটারী লরি।

—বাড়ি যান আপনি।

—কে? পিছনে ফেরে গোপেন।

কানু বললে—আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল গোপেনের বুক থেকে। কানুর সঙ্গে নেবুর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ইদানীং গোপেনের সন্দেহ হত—অহেতুক সন্দেহ নয়—তির্যক কটাক্ষে কানুর দিকে চেয়ে নেবুকে সে হাসতে দেখেছে। কানুর উপর রাগ হল তার। কাল রাত্রে একবার সন্দেহও হয়েছিল কানুর উপর।

—তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

—ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে যাব। উণ্ডেডদের জন্য অনেক রক্ত দরকার।

—চল, আমিও যাব।

—না। আপনি নিজেই জখম হয়েছেন। তা ছাড়া কালই ট্রাম-বাস খুলবে বোধ হয়। আপিস যেতে হবে তো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোপেন। কালই ট্রাম-বাস খুলবে! আপিস যেতে হবে! হবে বই কি। না গেলে? না গেলে চাকরি চলে যাবে। কেমন যেন ফ্যাকাশে মড়ার মত চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর। মাথা হেঁট করে সে ফিরে এল। পথে দোকানে চা খাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চায়ের দোকানও বন্ধ সব। কলকাতায় দুধ আসছে না আজ দুদিন ধরে। বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে সে আবার বিড়ি খেতে লাগল।

দেবা আর ট্যাবা ভাম হয়ে বসে আছে। ওদের জীবনের তার খুব টেনে বেঁধেছিল ওরা, হঠাৎ সেটা আবার আলগা হয়ে গিয়েছে। কিছু আর ভাল লাগছে না তাদের। সে-দিনটা তাদের কি আনন্দেই গিয়েছে। এমন অপার অসীম আনন্দ তারা জীবনে কখনও পায় নি।১৯৪৬ সালের বাঙলা দেশের বালক তারা—তারা জয়হিন্দ জানে—বন্দে মাতরম্ জানে—নেতাজী জানে—মহাত্মাজী জানে—স্বাধীনতা জানে! সে জানা অবশ্য স্পষ্ট নয়, একটা অস্পষ্ট গুরুত্ব, পবিত্রতা, মাহাত্ম্য, উত্তেজনা তারা মনে-প্রাণে অনুভব করে। সেদিন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, সে পরিচয়ের আনন্দের সঙ্গে আরও একটা আনন্দ তারা অনুভব করেছিল। মাটির উপরে অকারণ লাঠির আঘাত করে যে আনন্দ তারা পায়, কচুগাছ কেটে যে আনন্দ পায়, আবর্জনায় আগুন লাগিয়ে যে আনন্দ পায়, সেই আনন্দ অপরিমিত পরিমাণে তারা অনুভব করেছিল। আলাদিনের প্রদীপের ঐশ্বর্য এসে গিয়েছিল যেন জীবনে। সে প্রদীপ আবার হারিয়ে গেল। তারা যেন অত্যন্ত গরিব হয়ে গিয়েছে। চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

শান্তি এখনও মধ্যে মধ্যে অবসর পেলে কাঁদছে। মধ্যে মধ্যে ডাক ছেড়ে সেই একটি কথাই বলছে—ভগবান, শেষে এই করলে?

গোপেন বসে থাকে চুপ করে, দাঁতে দাঁত টিপে। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে না, সান্ত্বনাও খুঁজে পায় না। শান্তি চুপ করলে সে ভাবে—কাল আপিসে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে! কৈফিয়ৎই হয়তো লাগবে না; কিন্তু যদি লাগে—তবে?

তার মনে ধরেছে শান্তির আবিষ্কৃত কৈফিয়ৎটি। ডাক্তারকে শান্তি বলেছিল—কাজে বেরিয়ে পথে হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিল, হাঙ্গামাকারীরা ঢেলা ছুঁড়ছিল, সেই ঢেলা লেগেছে মাথায়—পুলিস গুলি চালিয়েছিল, সেই গুলি লেগেছে পায়ে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। শরীরটা সুস্থ হবে কাল সকালে। কাল আপিস যেতে হবে। ট্রাম বাস খুলবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার। আজ সত্য সত্যই বাস-ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছে।

খবরের কাগজে হেড লাইন ছাপা হয়েছে—ঝড়ের পর শান্ত কলিকাতা।

ঝড় বই কি! এ ঝড় নূতন নয়। মানুষের সমাজ গঠনের প্রারম্ভ থেকে এ ঝড় উঠছে। কখনও বড়—কখনও ছোট। শাসকের শাসন-, বঞ্চকের বঞ্চনা-, উৎপীড়কের উৎপীড়ন-শৃঙ্খলিত, বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের চোখে যখন অশ্রু ঝরে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয় যত বিন্দু অশ্রু তত বিন্দু ক্ষোভ। উত্তাপ বাড়তে থাকে মাত্রায়-মাত্রায়।

তারপর এক দিন অকস্মাৎ জাগে ঝড়। অতীত কালেও বার বার জেগেছে—এ কালেও জাগছে। শৃঙ্খলিত মানব-সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খলে তাতে ফাট ধরছে কি না—কে জানে! মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে তাই, সে বিশ্বাস করে বন্ধনের গ্রন্থি একটার পর একটা কাটছে।সে বিশ্বাস যদি তার মিথ্যাও হয়। তবুও তার এতেই একমাত্র সান্ত্বনা। যুগব্যাপী দুঃখের পর এই পরম দুর্যোগের মধ্যেই পায় সে পরমানন্দের আস্বাদ। ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রত্যাশা করে থাকে—এর পর আসবে আবার বড় দুর্যোগ। তাই প্রলয়ের মধ্যে বৈষম্য অন্যায়-অধর্ম-পীড়িত পৃথিবীর শেষ এবং সত্যের ভিত্তিতে সুখ-শান্তি-ভরা নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনাই তার আদিম শ্রেষ্ঠ এবং সার্বজনীন পরিকল্পনা। সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গোপেন বার হল।

* * *

আপিসে তার মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে সাহেব ডেকেছিলেন। গোপেন সেই শান্তির রচনা করা মিথ্যা কৈফিয়তই দিলে। তা ছাড়া আর কি বলবে! অদ্ভুত ভাগ্য গোপেনের। সাহেব তাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিলেন। আর দিলেন নিজে থেকে কুড়ি টাকা চিকিৎসার জন্য সাহায্য।

গোপেন আফিস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসে রইল সারা দিন। উদাস দৃষ্টিতে দূরে কলকাতার মাথার উপরে যেখানে ইডেন গার্ডেনের গাছে, বড় বড় বাড়ির মাথার কোলে—আকাশ এসে নেমেছে—সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। শীতের শেষে গাছ থেকে পাতা খসে পড়ছে—কতগুলো ঝরা পাতার উপরেই সে বসেছিল। মাথার উপরের গাছটার ডালে নতুন কচি পাতা দেখা দিয়েছে স্তবকে স্তবকে।

হঠাৎ এক সময় তার চোখে পড়ল একখানা বাসের মধ্যে যাচ্ছে সেই মেয়েটি। সেই রহস্যময়ী মেয়েটি—হ্যাঁ, সেই! ভর্তি দুপুরের বাস, লোকজন বিশেষ নেই, সামনের সিটে বসে আছে সেই—সেই মেয়ে। তার পাশে ও কে? কানু? হ্যাঁ—কানুই তো! কানু জুটল কি করে? দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছে। কানুর চেহারাটা পর্যন্ত পাল্‌টে গিয়েছে যেন—মেয়েটির মুখের দীপ্তির আভা পড়েছে মনে হচ্ছে। ওঃ, বুঝতে পেরেছে গোপেন। কানু ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছে—কোন রকমে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার জীবনে আর হল না, সময় নেই। বুড়ো বয়সে তার আর সময় নেই। এক মুঠো ঝরা পাতা মড়মড় করে ভেঙে ফেললে সে। হঠাৎ মনে হল, সে এই ছেঁড়া ঝরা পাতার মতই পড়ে রইল। হে ভগবান!

নাঃ! দুঃখ সে করবে না। নতুন কচি কানুর দল—তোদের বেষ্টনীর মধ্যে ফুল ফুটুক, ফল ধরুক। সে ঝরা পাতা। গলে পচে সার হয়ে তোদের পুষ্টি যোগাতে যেন পারে এইটুকু ভাগ্য ছাড়া ভগবানের কাছে তার আর কিছুই চাইবার নেই। আর কি চাইবে সে? আরও অনেকক্ষণ বসে রইল তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল সে। কুড়িটা টাকা পকেটে আছে। দেবা-ট্যাবা যে ঘড়ি দুটো এনেছে—সে দুটোকেও বেচে ফেলবে আজ। তাতে কিছু হবে। এই তার নেবুর দাম। হঠাৎ তার মন তাকে ছি-ছি করে উঠল—কাপুরুষ—মিথ্যাবাদী! সে মাথা নেড়ে উঠল সজোরে—না—না—না।

মিথ্যাবাদী সে হয়েছে—কিন্তু না—কাপুরুষ সে নয়। কখনও নয়। না—না—না। যদি আবার কখনও দিন পায় তো সে তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলতে লাগল। নেবুর একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। গোপনে—অত্যন্ত গোপনে। কালীঘাটে গিয়ে করে আসবে। তার আত্মার শান্তি চাই— সদগতি চাই।

—আঃ, নেবু! নেবু রে! মা!